শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ১।৵০ এক টাকা দশ আনা।

Published by
Norendra Kumar Seal
CROWN LIBRARY
178 Nimoo Gossaius Laue
CALCUTTA

প্রবীণ-সাহিত্যিক—

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত

(নূতন পারিবারিক উপন্যাস)

বিষ-দৃষ্টি

(যন্ত্রস্থ)

SEALPRESS
Printed by S. K. SEAL.
333, Upper Chitpur Road,
Calcutta.

উপহার-পৃষ্ঠা।
এই গ্রন্থখানি
আমার
প্রদত্ত হইল।
তারিখ............
শ্রী

জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরস্পর সাক্ষাতে

রাত্রি দ্বিপ্রহর। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। নিবিড়ান্ধকারে মেদিনী মসিময়ী। অনন্তাকাশ বর্ষণোন্মুখ নীরদপটলে সমাচ্ছন্ন। তারকাস্তবক সে নিবিড় নীরদ-জালের অন্তরালে অন্তর্হিত। প্রবল প্রভঞ্জন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একটা খণ্ড প্রলয়ের সৃষ্টি করিবার মানসেই যেন গর্জ্জিয়া-গর্জ্জিয়া ভীমবেগে বহিয়া যাইতেছিল।

রাত্রির এইরূপ অবস্থা—যেমন দুর্য্যোগময়ী—তেমনই ভীষণা। সাধ্যসত্বে কেহ ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা করে না। সকলেই আপন-আপন আবাশে শঙ্কাকুল-মানসে শয্যার উপর শায়িত। কেবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রহরীবৃন্দ প্রকৃতির এই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যেও আমেদাবাদ দুর্গ-প্রাকারের উপর উন্মুক্ত তরবারি করে দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত।

নগরবাসী প্রায় সকলেই সুষুপ্ত। কেবল নবাবের প্রাসাদমধ্যে একটী কক্ষে দুইটী রমণী বিমর্ষবদনে উপবিষ্টা। উহাদের মধ্যে একটী বর্ষিয়সী—অপরা যুবতী। প্রথমা যবনী—দ্বিতীয়া হিন্দু-রমণী। ইহাদের জাতিগত পার্থক্য, তাঁহাদের পরিহিত বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য করিলেই অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। যবনীর বয়ঃক্রম

অনুমান পঞ্চাশ। পরিধানে সাদা বেশ, মুখশ্রী গম্ভীর, সরলতা-পূর্ণ। যুবতীর বয়স অষ্টাদশের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম—মুখাকৃতি সুশ্রী—চক্ষু দুইটী আয়তোজ্জ্বল—নাসা সুগঠিত। নিরাভরণ দেহ। পরিধানে গৈরিক বাস। সেই গৈরিক বসনের মধ্যেও বিধবার নিরাভরণ দেহের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তি গৃহমধ্যগত দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মুখখানি শত-সৌন্দর্য্যে পরিপুষ্ট কিন্তু উপস্থিত তাহার উপর বিষাদের একটা ছায়া ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে। গৈরিকবসনা অনেকক্ষণ অনন্যমনা হইয়া বসিয়া থাকিয়া, শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মর্ম্মপীড়িত-কণ্ঠে কহিলেন,—"মতি বিবি! এখন তবে উপায়? এ দুর্য্যোগে কেমন করিয়া বাহির হইব?"

মতিবিবি আশ্বাসবাক্যে কহিল,—"দুর্য্যোগে বরং সুবিধাই হইবে। পথঘাট জনশূন্য। ভয় কি! আমি তোমার সঙ্গে যাইব। দুর্য্যোগ দেখিয়া ভয় পাইলে, এমন সুযোগ আর ঘটিবে না। অন্দরের প্রহরী আমার কৌশলে অচেতন—অনায়াসে আমরা স্বকার্য্য সাধন করিয়া আসিতে পারিব। তুমি বড়ই কাতর হইয়াছিলে, তাই আমি অনেক কৌশল করিয়া তাঁহার সন্ধান লইয়াছি। তিনিও একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি সাক্ষাতের সকল বন্দোবস্তই করিয়াছি। এখন যাওয়া না যাওয়া তোমার উপর নির্ভর করে।"

মতিবিবি নীরব হইল। যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চোখের জল মুছিয়া, তাহার দিকে কাতরনয়নে চাহিয়া কহিলেন,—"মতি বিবি! আহা তোমার মত যদি সকল মুসলমানের হৃদয় হইত, তাহা হইলে আজ আমাকে এমন অবস্থায় যবনদুর্গে বন্দিনী হইয়া

প্রতিপলে জাতিধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত না। পিতা, মাতা, ভ্রাতার স্নেহের শীতল ছায়া ছাড়িয়া, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে হইত না।"

যুবতী আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মতিবিবি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল,—"এস, আর বিলম্ব করিও না—তিনি বোধ হয় এতক্ষণ উদ্যানমধ্যে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

যুবতী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, মতি বিবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। এখনও আকাশের সেই ভাব। তাঁহারা নিঃশব্দে অনেক কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং দ্বার অতিক্রম করিয়া, অন্দরমহলের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। মতিবিবি যুবতীর বাহুলতা আকর্ষণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "খুব সাবধান!"

এইসময়ে একবার সৌদামিনী বিভাসিত হইল। ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী আলোকে যুবতী দেখিলেন দ্বার উন্মুক্ত—দৌবারিক অসি-চর্ম্ম পার্শ্বে রাখিয়া, নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তথাপি তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতে যুবতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

তাঁহারা অন্দর হইতে বহির্গত হইয়া বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ফটকে প্রহরী সজাগ—তাহার সম্মুখ দিয়া পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত বাহির হইবার উপায় নাই। মতিবিবি অনেকদিনের পরিচারিকা। প্রাসাদের অনেক গুপ্তপথের সন্ধান তাহার জানা আছে। একটী গুপ্তপথের সাহায্যে তাঁহারা অপরের অলক্ষ্যে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যটনের পর নগরের উপকণ্ঠে একটী উদ্যানের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। উদ্যানটী বহুকালের—অযত্নে অধিকাংশস্থলই

বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ—কেবল মধ্যস্থ পুষ্করিণীর পাড়গুলিই কতকটা পরিষ্কার। মতিবিবি চপলালোকে নির্দ্দিষ্টস্থানে একজনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, যুবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ঐ তিনি অপেক্ষা করিতেছেন—যাও, তোমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমার নিকট আসিও,—আমি এইস্থানেই তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।"

যুবতী সঙ্কেতস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই যোগানন্দ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মেঘ ডাকিল—চপলা চমকিল, যোগানন্দ দেখিলেন, সম্মুখে রোরুদ্যমানা জয়ন্তী দণ্ডায়মানা। কাহারও মুখে বাঙনিষ্পত্তি নাই—উভয়েই নীরব—উভয়েরই চক্ষে জলধারা—উভয়েরই বক্ষে বাহ্য-জগতের এই ভীষণ দুর্য্যোগের মত, এমনই নিবিড় অন্ধকার, এমনই বাত্যাকুলিত একটা ভীষণ ভাব সমস্ত হৃদয়টাকে আলোড়িত করিয়া, ঐ বায়ু গর্জ্জনের মতই গর্জ্জিয়া-গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জয়ন্তীই অগ্রে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"দাদা! বাবা কোথায়? মা'র খবর কি? তুমি কেমন আছ?"

যোগানন্দ অতি বলে হৃদয়টাকে চাপিয়া ধরিয়া, অস্বাভাবিক-কণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা নিরুদ্দিষ্ট! মা স্বর্গে! আর আমি? আমি আছি ভাল!"

যোগানন্দের কণ্ঠস্বর শুনিয়া জয়ন্তী চমকিয়া উঠিলেন। সেই সময়ে মাথার উপর সমস্ত আকাশটাকে অগ্নিময় করিয়া আবার বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল। সেই তীব্রালোকে যোগানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া জয়ন্তীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহার মুখের ভীষণ ভাব দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। জয়ন্তী কাঁদিয়া কহিলেন,—"দা

ভগবান! এত কষ্ট কি আমাদের অদৃষ্টে লিখিয়াছিলে? মা—মা! কোথায় তুমি!"

চোখের জলে জয়ন্তীর বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মাতার মৃত্যু-সংবাদ এতদিন তাহার কর্ণগোচার হয় নাই। তিনমাসের পর আজ সংবাদ পাইয়া জয়ন্তী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

যোগানন্দ কহিলেন,—"জয়ন্তি! বাবার কোন সংবাদ নাই। শোকে, দুঃখে, অত্যাচারে মাতার মৃত্যু হইল। জয়ন্তি! তুই কোন্ সুখে জীবিত রহিলি? জাতি গেল—ধর্ম্ম গেল—ধন গেল—এক ফুৎকারে সব নিবিয়া গেল! যা'ক সব যা'ক—সব সহ্য হয়! কিন্তু ভগিনী পাপিষ্ঠ যবন-করে তোর উচ্ছেদ, প্রাণ থাকিতে সহ্য হইবার নয়! তুই যদি মরিতিস—ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া তুই যদি প্রাণ দিতে পারিতিস, আমি মরিবার সময়ও সুখে মরিতে পারিতাম! কি যাতনা জয়ন্তি! ব্রাহ্মণ কন্যা—দেশপূজ্য মাধবগিরির দুহিতা—যোগানন্দের ভগ্নী আজ হেয় নবাবের ভোগ্যা! স্বর্গসুধা কুকুরের ভক্ষ্য!—"

বাধা দিয়া অশ্রুপ্লাবিতা জয়ন্তী কহিলেন,—"না দাদা! তোমার ভগ্নীর এখনও ততদূর অধঃপতন ঘটে নাই! যবন-গৃহে বন্দিনী বটে, কিন্তু এখনও তাহার নারীধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে কেহ সাহস করে নাই! যবন-স্পৃষ্ট আহার্য্য-পর্য্যন্তও স্পর্শ করি নাই!"

যোগানন্দ সহসা কোন উত্তর করিলেন না। জয়ন্তী ভাবিলেন, তাঁহার কথায় তাঁহার সহোদর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। যুবতী বক্ষের মধ্য হইতে কি একটী পদার্থ বাহির করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"দাদা! আমায় অবিশ্বাস করিতেছ? ভাবিতেছ পাপাসক্ত পিশাচের গৃহে বাস করিয়া, আমার মত যুবতীর সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব? কিন্তু ইহারই ভয়ে কেহ আমার ত্রিসীমানায় আসিতে

সাহস করে না। কু-অভিপ্রায়ে কেহ আমার সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র যদি আর কিছুই না পারি—আত্মহত্যা করিতে পারিব—সে সাহস আমার আছে।”

এই বলিয়া হস্তস্থিত ছুরিকা তুলিয়া ধরিলেন। সেইসময়ে আবার বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করিয়া, সৌদামিনী বিভাসিত হইল। ছুরিকার শাণিত ফলকের উপর চপলার দীপ্তি পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। যোগানন্দ আশ্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—“এইবার আমি হাসিতে-হাসিতে মরণকে বরণ করিতে পারিব। জয়ন্তী আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বেই যেন তোর মৃত্যু হয়। জয়ন্তী আর একটু কাজ করিলে হয় না?”

কি দাদা?

যোগানন্দ। হাঁটিতে পারিবি?

জয়ন্তী। খুব পারি। কেন দাদা?

যোগানন্দ। চল আমরা পালাই। রাত থাকিতে-থাকিতে আমরা যাইতে পারিব।

তাহা পারিব বটে কিন্তু আমি যাইব না।

যোগানন্দ। কেন?

জয়ন্তী। মতিবিবির দশা কি হইবে! সে যবনী হইলেও করুণাময়ী—তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না। তাহার উপর আমার রক্ষার ভার আছে—আমি পলায়ন করিয়াছি শুনিলে, নবাব তাহাকে জীবন্ত কবর দিবে।

যোগানন্দ। তবে তোর উপায়? কেমন করিয়া মুক্তি পাইবি?

জয়ন্তী। যিনি মুক্তিদাতা—তিনিই আমার মুক্তির বিধান

মতি। চল—তবে আর বিলম্ব করিও না। রাত্রি আর অধিক নাই।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহারা গুপ্তদ্বারের অভিমুখে যেমন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ঠিক সেইসময়ে পার্শ্বস্থ একটা কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। তাঁহারা অন্ধকারে আত্মগোপন করিবার পূর্ব্বেই আলোকহস্তে এক ব্যক্তি তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক একজন ভৃত্য। সভয়ে মতিবিবি দেখিলেন, আলোকধারী ভৃত্যের পশ্চাতে স্বয়ং নবাব হাসান উল্লা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারাকক্ষে

আমেদাবাদের অধীশ্বর হাসান উল্লা মন্ত্রণাগৃহ হইতে অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, দৈবযোগে জয়ন্তী এবং মতিবিবি তাঁহার সম্মুখে পড়িল। এরূপ সময়ে তাঁহাদিগকে অন্তঃপুর-বাহিরে দর্শন করিয়া নবাব সাহেবের মনে যুগপৎ সন্দেহ এবং বিস্ময় জন্মিল। তিনি মতিবিবিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“মতি! এত রাত্রে এ বাঁদিকে সঙ্গে করিয়া কোথায় যাইতেছিলে? এ রমণী আমার অনুকম্পা অগ্রাহ্য করিয়া এতদিন আমার অন্তঃপুরে বাস করিতেছিল, এখন কাহার প্রতি এ-যুবতীর আসক্তি পড়িয়াছে? কাহার নিকট ইহাকে লইয়া অভিসারে গমন করিতেছিলে?”

মতিবিবির সমস্ত দেহটা যেন পাষাণে পরিণত হইয়াছে। সে নবাবকে দেখিয়া সেলাম করিতে ভুলিয়া গেল। তাঁহার প্রশ্নের

কোন উত্তর করিতে পারিল না। কেবল অবনতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

কথার উত্তর না পাইয়া নবাব রুষ্ট হইলেন। রুক্ষস্বরে কহিলেন, আমার প্রশ্ন কি আপনার কর্ণগোচর হইতেছে না?

মতির সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাক্ত হইয়া উঠিল। আভূমি সেলাম করিয়া কহিল,—"জাঁহাপনা!——"

তাহার মুখ দিয়া আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। নবাব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর? বল্‌ শীঘ্র বল্‌।"

মতি পুনরায় কুর্ণিস করিল কিন্তু তাহার জিহ্বার জড়তা ভাঙ্গিল না। নবাবের ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হইল। অসিকোষে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—"বল দুষ্টা! এখনও বল এ-রমণী কাহার প্রত্যাশায় গৃহের বাহির হইতেছিল? কোন্ ভাগ্যধর পুরুষ এ-রূপসীর বিম্বাধর-সুধাপানের অভিলাষী হইয়াছিল? আর কি উপায়েই বা তোমরা অন্তঃপুর বাহিরে আসিতে সমর্থ হইলে? আমার কথার সদুত্তর দাও, নচেৎ আমার হাতে কোনরূপেই তোর নিস্তার থাকিবে না।"

মতি দেখিল আর নীরব থাকা কর্ত্তব্য নয়; বরং তাহাতে নবাবের ক্রোধ এবং সন্দেহ বর্দ্ধিত হইবে। এই ভাবিয়া সে কথা বলিতে উদ্যত হইল। পুনরায় কুর্ণিস করিয়া কহিল,—"খোদাবন্দ! জনাব! আমি আপনার একজন সামান্যা পরিচারিকা—আমি সত্য করিয়া বলিতেছি এ-রমণী সতী সাধ্বী——"

বাধা দিয়া নবাব কহিলেন,—"সতী কি উপপতির আশায় অভিসারে বাহির হয়? তোমার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না—এখন বল নবাব অপেক্ষা কোন্ পুরুষের ভাগ্যে

সুপ্রসন্ন, কাহার উপর এই সুন্দরীর কৃপাকটাক্ষ আপতিত হইয়াছে?"

জয়ন্তী এতক্ষণ মতির পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে সম্মুখে আসিয়া, মতিবিবির অনুকরণে কুর্ণিস করিয়া কহিলেন,—"যমের উপর! হিন্দু-বিধবার চক্ষে এমন সুপুরুষ আর নাই।"

নবাব বিস্ফারিতনয়নে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জয়ন্তী কহিলেন,—"জাঁহাপনা! যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আমাকে করুন। মতি বাঁদি—তাহার কোন অপরাধ নাই, আমার প্ররোচনায় সে আমার সহিত যাইতে সম্মত হইয়াছিল, এইমাত্র তাহার অপরাধ।"

নবাব। তুমি কোথায় যাইতেছিলে?

জয়ন্তী। যাই নাই ফিরিয়া আসিতেছিলাম।

নবাব। অন্তঃপুরের পথ কি ঐ দিকে?

জয়ন্তী। অন্তঃপুরের পথে প্রতিবন্ধক দেখিয়া, অন্য পথের সন্ধান করিতেছিলাম।

নবাব। কোথায় গিয়াছিলে?

জয়ন্তী। কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

নবাব। সে পরমাত্মীয়টী কে? বোধ হয় কোন প্রেমাস্পদ?

জয়ন্তী। প্রেমাস্পদ ভিন্ন বুঝি সংসারে আর আত্মীয় নাই?

নবাব। আছে কিন্তু তাহার জন্য তোমার মত রূপসীরা এমন দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া বাটীর বাহির হয় না।

জয়ন্তী। নবাব সাহেব! বেয়াদবি মাপ করিবেন। কুলনারীর পক্ষে কোনসময়েই বাটীর বাহির হওয়া কর্ত্তব্য নয় কিন্তু দেশের

রাজা যখন অত্যাচারের প্রশ্রয় দেন, তখন কুলকামিনীকে বাধ্য হইয়া গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ করিতে হয়।

যুবতীর নির্ভীকতা দেখিয়া নবাব বিস্মিত হইলেন। কহিলেন,—"সুন্দরি! আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে তোমার সাহস হইতেছে? তোমার বাক্‌পটুতা এবং নির্ভীকতা দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি সত্য কথা বল, আমি তোমার অদ্যকার অপরাধ ক্ষমা করিব।"

জয়ন্তী। নবাবের সম্মুখে সত্যই বলিব।

নবাব। কি উদ্দেশে বাটীর বাহির হইয়াছিলে?

জয়ন্তী। আমার সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

নবাব। সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

জয়ন্তী। হইয়াছিল।

নবাব। তুমি বন্দিনী—বাটীর বাহির হইবার অবসর পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া আবার ফিরিতেছিলে কেন?

জয়ন্তী। শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম।

নবাব। স্বেচ্ছায় আস নাই?

জয়ন্তী। চিরবন্দিত্বে কাহার বাসনা!

নবাব। কেন আমার ঐশ্বর্য্য—রাজপ্রাসাদের সুখভোগ—আমার ভালবাসা কি উপেক্ষার জিনিষ? ইহাদের কি কোন আকর্ষণী শক্তি নাই?

জয়ন্তী। খোদাবন্দ! আমি হিন্দু বিধবা—ব্রহ্মচারিণী—আমার পক্ষে প্রাসাদ এবং পর্ণকুটীর সমতুল্য। হিন্দু-বিধবা ভোগস্পৃহা বিষবৎ ত্যাগ করে।

নবাব। হইতে পারে কিন্তু তোমাকে আমি ত্যাগ করিতে পারি।

না। আমি তোমার রূপে এবং গুণে মুগ্ধ হইয়াছি—তোমার প্রেমের শীতল ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ কর।

জয়ন্তী। নবাব সাহেব! আমরা হিন্দু। হিন্দু-বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় না।

নবাব। তোমার হিন্দুত্ব ঘুচাইয়া দিলে বোধ হয় এ-বাধা থাকিবে না। কালই তোমায় আমাদের সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিব। মুসলমান হইলে আর এ-আপত্তি থাকিবে না।

জয়ন্তী। দেহের উপর বল প্রয়োগ চলে কিন্তু মনের গতির পরিবর্ত্তন করা কোন রাজশক্তিরই সাধ্য নয়।

নবাব। আমি তিনমাস তোমার উপর কোনরূপই বলপ্রয়োগ করি নাই—যদি সহজে তুমি আমার অন্তঃপুরচারিণীগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে না চাও—অবশ্য তোমার উপর বল প্রযুক্ত হইবে।

জয়ন্তী। আমেদাবাদের শক্তিমান অধীশ্বর ক্ষুদ্র অবলার প্রতিও যে বলপ্রয়োগে সিদ্ধহস্ত, তাহা আমি জানি।

নবাব। জানিয়াও কি তোমার ভয় হইতেছে না।

জয়ন্তী। কিসের ভয় নবাব সাহেব! প্রাণের? বিধবার আবার প্রাণের মমতা কি? সংসারে যে কয়টী বন্ধন ছিল, আপনার মত কৃতান্তের কুঠারাঘাতে তাহাদেরও মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, সুতরাং আর কিসের আশায়, জীবনের মমতায় আপনার পদানত হইয়া পড়িব?

নবাব। জীবন অপেক্ষা আরও যদি কিছু প্রিয়তম থাকে?

জয়ন্তী। আপনার মত শত নবাব একত্র হইলেও, তাহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। আমার ছায়াস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে, আমার প্রাণহীন দেহ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইবে। যদি অভিরুচি

হয়, শ্মশানভূমে প্রেতের মত, আমার প্রাণশূন্য দেহ লইয়া, যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

নবাব। তোমার মত মুখরা এবং দর্পিতা নারীর দর্পচূর্ণ করিতে যদি না পারি, আমার শাসনদণ্ড ধারণ করাই বৃথা। কাল হইতে তোমার অন্নজল বন্ধ করিয়া দিব।

জয়ন্তী। হিন্দুবিধবার উপবাস করা অভ্যাস আছে।

নবাব। দেখিব কতদিন তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করিয়া থাকিতে পার!

জয়ন্তী। নবাব সাহেব বোধ হয় জানেন না যে হিন্দুরা প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করে?

শেষ কথাটা নবাব সাহেব ভাল করিয়া বুঝিলেন না। জয়ন্তীকে কোনরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, দেখা যাইবে, শেষপর্য্যন্ত কাহার জয় হয়! প্রহরি!"

একজন প্রহরী আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া, প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব কহিলেন,—"আজ রাত্রির মত এই দুই রমণীকে একটা কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখ, কাল যথাকর্ত্তব্য স্থির করিব।"

প্রহরী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিল। নবাব নিকটস্থ অপর একজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"প্রাতে প্রত্যূষে তালেখাঁকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে।"

এদিকে প্রহরী জয়ন্তী ও মতিবিবিকে লইয়া একটী কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। জয়ন্তী এক্ষণে মতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—"মতি দিদি! আমার জন্য ভাবিও না—কিন্তু তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা হইতেছে। নবাব ক্রোধের বশে যদি,

তোমার কোন অনিষ্ট করেন, কি হইবে? আহা কেন আমার দুঃখে তোমার প্রাণ গলিয়াছিল?"

মতি গম্ভীরস্বরে কহিল,—"এখন আর খেদ করিয়া কোনই ফল নাই। যদি কোন অনিষ্টপাত হয়, সহ্য করিতেই হইবে।"

জয়ন্তী। তোমার আর কে আছে?

মতি। আল্লা আছে!

জয়ন্তী। সে ত সকলেরই আছে। আমি বলিতেছি,—ভাই, বোন কি সন্তান কেহ নাই?

মতি। সবই ছিল, এখন কিছুই নাই।

জয়ন্তী। যদি নবাব তাড়াইয়া দেয়?

মতি। তাহা হইলে ত বুঝিব দয়া করিলেন। কিন্তু অতটা অনুগ্রহ হইবে না।

জয়ন্তী। তবে কি দণ্ডের প্রত্যাশা কর?

মতি। মৃত্যুদণ্ড।

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। অবশেষে জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি তোমার জীবনরক্ষার কোনই উপায় নাই?"

মতি। 'তোমার' বলিতেছ কেন? বল "আমাদের"!

জয়ন্তী। আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। তোমার জীবন রক্ষার কোন উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছি?

মতি। একমাত্র উপায় আছে।

জয়ন্তী। কি?

মতি। তুমি যদি নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হও, উভয়েরই প্রাণরক্ষা হইবে।

জয়ন্তী। মতিদিদি! তুমি কি আমার সহিত উপহাস করিতেছ?

মতি। এই কি উপহাসের সময়?

জয়ন্তী। কিন্তু তাহা ত পারিব না।

মতি। তবে একটু ঘুমাও। আমার বড় ঘুম পাইতেছে।

জয়ন্তী। তোমার ঘুম আসিবে?

মতি। না আসার কারণ?

জয়ন্তী। তোমার ভয় হইতেছে না?

মতি। মরিতে হয় কাল মরিব, আজ কেন জাগিয়া বসিয়া থাকি!

মতি আর কোন কথা না কহিয়া সত্য-সত্যই তথায় শুইয়া পড়িল। জয়ন্তী বসিয়াই রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে শুনিলেন মতির নাক ডাকিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দস্যু-সর্দ্দার

ঊষার অরুণরাগ প্রকৃতির ললাটে অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বেই কা কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। জয়ন্তী চাহিয়া দেখিলেন দ্বারদেশে এক-জন সশস্ত্র সৈনিক। মতিবিবি চিনিল তালে খাঁ।

তালে খাঁ গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"তোমরা বাহিরে আইস।"

রমণীদ্বয় কোন কথা কহিলেন না। ধীরে-ধীরে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তালে খাঁ মতিবিবির দিকে ফিরিয়া কহিল,—"নবাব বাহাদুরের হুকুম তিনদিনের মধ্যে তুমি নগর ছাড়িয়া যাইবে—নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

তাহার পর জয়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"আর তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

জয়ন্তী সজলনয়নে মতির দিকে চাহিলেন। দেখিলেন মতি কাঁদিতেছে। জয়ন্তী কি বলিতে যাইতেছিলেন, তালে খাঁ নিষেধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। মতি চোখের জল মুছিতে-মুছিতে নিজের গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল।

গৃহের বাহিরে একখানি পাল্কি ও চারিজন বাহক দণ্ডায়মান ছিল। তালে খাঁর ইঙ্গিতে জয়ন্তী পাল্কিতে উঠিয়া বসিলেন। বাহকেরা পাল্কি উঠাইয়া চলিল। অদূরে একজন সহিস একটী সজ্জিত অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তালে খাঁ একলম্ফে তদুপরি আরোহণ করিল—দেখিতে-দেখিতে আরও ছয়জন অশ্বারোহী আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল।

জয়ন্তী কোন কথা কহিলেন না। স্থিরভাবে শিবিকায় বসিয়া রহিলেন। কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না।

তাহারা মধ্যাহ্নে একস্থানে উপস্থিত হইয়া শিবিকা নামাইল। তালে খাঁ সহচরগণের সহিত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক একটী বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল।

জয়ন্তী শিবিকার দ্বার ঈষদুন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, স্থানটী কোন লোকালয়ের প্রান্তভাগ। শিবিকা এবং অশ্বারোহী দেখিয়া গ্রামের অনেক বালক বালিকা আসিয়া তথায় সমবেত হইল। ক্রমে-ক্রমে দুই-একজন বয়স্থ এবং বয়স্থাও আসিয়া জুটিল। তালে খাঁ একজন প্রবীণকে আহ্বান করিয়া কি বলিল। সে ব্যক্তি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে ঘটী করিয়া খানিকটা দুগ্ধ এবং কিছু মিষ্টান্ন

আনিয়া তালে খাঁর সম্মুখে ধরিল। তালে খাঁ প্রবীণ ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, শিবিকার নিকট আসিল এবং জয়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"তুমি পাল্কীর বাহিরে আইস—ঐ দেখ পুষ্করিণী, হস্ত-মুখ প্রক্ষালন বা অভিরুচি হইলে স্নান করিয়া, এই দুগ্ধ এবং মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া লও। আমাদের কেহ উহা স্পর্শ করে নাই। গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে রাত্রি হইবে।"

জয়ন্তী পাল্কী হইতে বাহির হইয়া, জলাশয়তটে উপস্থিত হইলেন এবং হস্ত-পদ-মুখাদি প্রক্ষালনান্তর দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ভক্ষণপূর্ব্বক জলপান করিলেন, তাহার পর পাল্কীতে আসিয়া বসিলেন। ইত্যবসরে বাহকেরা এবং রক্ষীবর্গও যথাসম্ভব জলযোগ সারিয়া লইয়াছিল।

বাহকেরা পুনরায় পাল্কী উঠাইয়া চলিল। রক্ষীরাও স্ব-স্ব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শিবিকার অনুসরণ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ বেশ সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতেছিল। এইবার পথ বড় জটিল আরম্ভ হইল। পার্ব্বত্যপথ বন্ধুর এবং বন-জঙ্গলে পূর্ণ। আর পাঁচক্রোশ অতিক্রম করিলে তবে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে। সকলে দ্রুত চলিতে লাগিল। বেলাও ক্রমে অবসান হইয়া আসিল। বাহকেরা শিবিকা লইয়া যথাসম্ভব ছুটিতে আরম্ভ করিল। দিনদেব অস্তগত হইলে এ পার্ব্বত্য-পথে গমন করা তত সহজ নয়।

সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অরণ্যানী—পার্শ্বে পর্ব্বতমালা। মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত পথ। অস্তগমনোন্মুখ রবি-রশ্মি সম্মুখস্থ বিস্তৃত বনানীর উপর পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই শোভা দেখিতে-দেখিতে সকলে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। অকস্মাৎ বৃক্ষপত্রের শর-শর শব্দ হইল—সঙ্গে-সঙ্গে পুরোবর্ত্তী ব্যক্তি

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া ভূতলে পড়িল। সে ব্যক্তি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল,—"মলেম—শত্রু—আল্লা——"

সকলে সভয়ে দেখিল তাহার বক্ষে একটী শর আমূলবিদ্ধ হইয়াছে। বাহকেরা থামিয়া গেল। রক্ষীগণের কেহ বাণোন্মোচনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা অসিহস্তে আততায়ীর অনুসন্ধানে ছুটিল।

সহসা বনভূমির সান্ধ্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া,—"গুড়ুম—গুড়ুম" আওয়াজ হইল। আরও দুইজন অশ্বারোহী ললাট এবং বক্ষে বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে একটা মহা গোলযোগ বাধিয়া গেল। শত্রু অব্যর্থ-লক্ষ্য—গুপ্তস্থানে অবস্থিত, সুতরাং তাহাদের ছুটাছুটিই সার হইল। অকস্মাৎ চারিদিক হইতে "মার—মার" শব্দে ২০।২৫ জন সশস্ত্র যোদ্ধা বাহির হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দস্যুরা সংখ্যায় অধিক, মুহূর্ত্তমধ্যে রক্ষী ও বাহকদিগকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তালে খাঁ সকলের পশ্চাতে ছিল, পিস্তলের শব্দ হইবামাত্র, অশ্বের মুখ ফিরাইয়া পৃষ্ঠে কষাঘাত করিল। একমাত্র সেই পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জয়ন্তী শিবিকার মধ্যে অবস্থিত। এই নূতন বিপদের আবির্ভাবে তাঁহার যে বিশেষ কোন ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা ত বোধ হইল না। জীবনে যাহার মমতা আছে, সংসারে যাহার বন্ধন আছে, বিপৎপাতে তাহারই মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, সে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া মুহ্যমান হইবে কেন?

এদিকে দস্যুরা শিবিকার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,—"আপনি বাহিরে আসুন—আমরা আপনার সন্তান, সন্তানের নিকট মায়ের আশঙ্কা নাই।"

একি অভাবিত পরিবর্ত্তন! জয়ন্তী বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"একি হইল! ছিলাম মুসলমানের গৃহে বন্দিনী—এখন পড়িলাম দস্যুহস্তে। কোথায় তাহারা আমাকে হত্যা করিতে অথবা কোন পার্ব্বত্য-দুর্গে আজীবন বন্দী করিয়া রাখিতে লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে দস্যু আসিয়া উদ্ধার করিল। সূচনা দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহাদের অভিপ্রায় মন্দ নহে। অথবা আমার ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিবারই বা আবশ্যক কি? যেখানে ভগবানের রাখিবার ইচ্ছা হইবে, সেইস্থানেই অবস্থান করিতে হইবে।"

জয়ন্তীর বিলম্ব দেখিয়া দস্যু পুনরায় কহিল,—"মা নামিয়া আসুন, আমরা পাল্কীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

জয়ন্তী বাহির হইলেন। দস্যুরা লাঠির আঘাতে পাল্কীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমায় কোথায় যাইতে হইবে?"

পুরোবর্ত্তী দস্যু কহিল,—"দলপতির নিকট।"

জয়ন্তী কহিলেন,—"পথ দেখাইয়া চল, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

দস্যুরা অগ্রে-অগ্রে যাইতে লাগিল, জয়ন্তী তাঁহাদের পশ্চাতে ভাবিতে-ভাবিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে মুসলমানের গৃহ এবং দস্যুর আবাস উভয়ই সমতুল্য। সুতরাং অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে বিশেষ বিচলিতা হইলেন না। দস্যুরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, বনপথ ছাড়িয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। পার্ব্বত্য-পথ যেমন দুর্গম, তেমনই বিপদ-সঙ্কুল। প্রতিমুহূর্ত্তে পদস্খলিত হইয়া পতিত হইবার সম্ভাবনা। কোন-কোন স্থলে লতাগুল্মের অবিরল সন্নিবেশে বা পথের উপর প্রস্তরখণ্ড পতিত হওয়াতে পথ একেবারেই রুদ্ধ। কোথাও বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিয়া পথের উপর

পড়িয়াছে, কোথাও বা প্রস্তররাশি এত উচ্চ এবং বন্ধুর যে, জয়ন্তীর চলিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বেশ পরিষ্কার পথ পাওয়া গেল। জয়ন্তী যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, জল-কল্লোলের শব্দ তাঁহার কর্ণে ততই স্পষ্ট ধ্বনিত হইতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একটা বাঁক ফিরিবামাত্র এক অপূর্ব্বদৃশ্য তাঁহার নেত্র-পথবর্ত্তী হইল। অদূরে একটা উচ্চ পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিয়া জলধারা প্রবলবেগে নিম্নে প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িয়া একস্থানে জমা হইতেছে—এবং সেস্থান হইতে গড়াইয়া বহু নিম্নে পড়িতেছে। দিনমণির শেষ রশ্মিটুকু সেই গিরি-নিঃসৃতা নির্ঝরিণীর স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। নিম্নে পর্ব্বতমূল বিধৌত করিয়া যে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী প্রবাহিতা, এই নির্ঝরিণীই তাহার আদি জননী।

ঐ ঝরণার পার্শ্ব দিয়াই তাহাদের পথ। পথ অতি সঙ্কীর্ণ। দক্ষিণে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা—বামে এক অতি গভীর খাদ। এই খাদের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে অতি বড় সাহসীরও অন্তরাত্মা শুখাইয়া যায়। বামে অন্ধকার গভীর খাদ—দক্ষিণে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা, মধ্যে অপ্রশস্ত বন্ধুর পথ—তাহাও আবার সান্ধ্যান্ধকারে অস্পষ্টীকৃত। খাদের অপরপার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল। একজন দস্যু কহিল,—“মা! সাবধানে আসুন—পদস্খলিত হইলে আর রক্ষা করিতে পারিব না।”

ফিরিয়া-ঘুরিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া এই দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া, সকলে পর্ব্বত-শিখরে উপনীত হইল। এ স্থানটী বেশ পরিষ্কার, নানাজাতি ফল-ফুলে সুশোভিত। প্রকৃতির মনোহারিণী শান্তিময়ী শোভা দেখিয়া, জয়ন্তীর হৃদয় আনন্দরসে বিভোর হইয়া উঠিল। কি মহান্ দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব গরিমাময় সৌন্দর্য্য! বিশ্ব-

বিধাতার বিরাট প্রকৃতির এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব যদি এতই বিশাল--এতই মহান্, না জানি তাঁহার স্বরূপ কেমন! জয়ন্তী উদ্ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল—নিম্নে বহুদূরে বৃক্ষরাজীর মধ্যে গ্রাম-নগরাদির আকৃতি এখনও অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

পর্ব্বতের উপর একটী বেশ সমতল ক্ষেত্র। সেইস্থানে আরও কয়েকজন উপবিষ্ট রহিয়াছে। দূর হইতে জয়ন্তী দেখিল, ইহারাও সকলে সশস্ত্র। সকলেরই বীরবেশ—সকলেরই মুখে সাহসিকতা, নির্ভীকতা এবং হৃদয়ের দৃঢ়তা যেন প্রস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। ইহারা কে? নিশ্চয় ইহাদের সহচর। যদি তাহারা বনপথে সন্ধ্যার সময় তালে থাঁর দলবল বিনষ্ট না করিত, তাহা হইলে জয়ন্তী কখনই ইহাদিগকে দস্যু বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। তাঁহার উদ্ধারকারী শস্ত্রধারীরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া, উপবিষ্ট একব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একে-একে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। জয়ন্তী অনুভবে বুঝিলেন, ইনিই দলপতি বা এই দস্যুদলের সর্দ্দার। তিনি এতক্ষণ সকলের পশ্চাতে ছিলেন, এক্ষণে দলপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দলপতি নিরস্ত্র—পরিধানে গৈরিকবসন। কিন্তু ও কি! জয়ন্তী অমন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন কেন? বাতাভিহতা লতার মত তাঁহার অঙ্গযষ্টি কাঁপিতেছে কেন? জয়ন্তী বার-বার চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছেন কেন? যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহার বিশ্বাস হইতেছে না? তিনি আরও অগ্রসর হইলেন—উৎকট আনন্দে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। "বাবা—বাবা"—বলিয়া জয়ন্তী দলপতির চরণমূলে পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। মাধবগিরি কন্যার সংজ্ঞাহীন দেহলতা ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

মাধবগিরি নিষ্ঠাবান হিন্দু—নিবাস আমেদাবাদের উপকণ্ঠে এক ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে। সংসারে, স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রের বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ, নাম যোগানন্দ। কন্যা জয়ন্তীর বয়োক্রম অষ্টাদশ বর্ষ—সে বাল-বিধবা, পিতৃভবনেই বাস করে। মাধবগিরি দরিদ্র হইলেও তাঁহার সংসারে কোন কষ্ট বা অশান্তি ছিল না। প্রেমময়ী পত্নী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র এবং ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা কন্যাকে লইয়া, একপ্রকার সুখে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছিল। অসুখের মধ্যে জয়ন্তীর বৈধব্য—তাহাও তাঁহাদের সহ্য হইয়া আসিয়াছিল। যোগানন্দের এখনও বিবাহ হয় নাই।

সহসা একদিন তাঁহার অদৃষ্টাকাশে কালমেঘের সঞ্চার হইল—তাঁহার অদৃষ্টচক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। সংসারে যাহা কিছু সুখ-শান্তি ছিল সে নেমির চক্রস্পর্শে নিষ্পেষিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রত্যহ যেমন সন্ধ্যায় নদীতটে সায়ং-সন্ধ্যা সমাপন করিতে যান, সেদিনও গিয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে সন্ধ্যার কার্য্য সমাপন করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে বিপদ ঘটিল। সুরামত্ত কতকগুলি লোক পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, মাধবগিরি তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র, একব্যক্তি টলিয়া তাঁহার গায়ে পড়িল। দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার করিবার

মানসে, তিনি পাশ কাটাইয়া সরিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাকে পলায়নপর দেখিয়া মদ্যপগণের মধ্যে একব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে তাঁহার আর্কফলা ধরিয়া একটান মারিল। বিষম যাতনায় ব্যথিত হইয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন,—"জাফর খাঁ," নবাবের প্রিয় অনুচর। লোকটা সৈনিক বিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী; কিন্তু বড়ই অহঙ্কারী, মদ্যপ এবং লম্পট। বিধবা জয়ন্তীর উপর তাহার পাপ-নজর পড়িয়াছিল। লোকদ্বারা চেষ্টাও করিয়াছিল—কিন্তু প্রতিবারেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। মাধবগিরিও একবার তাঁহাকে মৃদু-ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহার জাতক্রোধ হইয়াছিল। অদ্য অবসর পাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে এবং জয়ন্তীর সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

মাধবগিরির আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহাদের আমোদ আরও বাড়িয়া গেল। জাফর খাঁ পুনরায় তাঁহার শিখা ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিপন্ন ব্রাহ্মণ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"কেন জমাদার সাহেব এ নীরিহ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিতেছেন, আমায় ছাড়িয়া দিন—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জাফর খাঁ কহিলেন,—"যে কেহ ঐ উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া এই বেয়াদব ব্রাহ্মণের টিকি ধরিয়া তুলিতে পারিবে, আমি তাহাকে পাঁচটাকা বকসিস দিব।"

মাধবগিরি ভয়ে চীৎকার করিয়া, যুক্তকরে কহিলেন,—"দোহাই বাপ সকল! তোমাদের আল্লার দিব্য, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ঘরে যাই।"

কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। একব্যক্তি তাঁহার

আর্কফলা ধরিয়া তাঁহাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সামান্য কেশগুচ্ছ সমস্ত শরীরের ভার বহিতে সক্ষম হইবে কেন? কেশমূল উৎপাটিত হইয়া অত্যাচারীর হাতে থাকিল, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। পাষণ্ডদলে হাসির তরঙ্গ ছুটিল। ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া, আত্মসংযমে অসমর্থ হইলেন, যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া, জমাদার সাহেবকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। জাফর খাঁর ইঙ্গিতে দুই-তিনজনে তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার মুখে নিষ্ঠিবন দিল।

সেস্থান হইতে তাঁহাদের কুটীর বেশী দূর নয়। যোগানন্দ লোকমুখে সমাচার পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, এক ব্যক্তিকে এক চপেটাঘাত করিলেন। আহত ব্যক্তি ভূমিতে পড়িয়া রক্তবমন করিতে লাগিল। স্বয়ং জাফর সাহেব বাধা দিতে উদ্যত হইলেন, ক্রোধান্ধ যুবক তাঁহার বক্ষে এক পদাঘাত করিল। জাফর সাহেব দলবল লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

মাধবগিরি ও যোগানন্দ কাঁদিতে-কাঁদিতে বাড়ী ফিরিলেন। শত্রু আপাততঃ পলায়ন করিল বটে কিন্তু এ কার্য্যের পরিণাম যে অতি ভয়ঙ্কর,—তাহা তাঁহারা সহজেই অনুমান করিয়া লইলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহারা অভিনব বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। যোগানন্দ কতকটা সুস্থির হইলেন। তাঁহারা সকলে শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের কুটীরের চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

জাফর সাহেব দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাঁহার অনুগত ২০।২৫

সৈনিক লইয়া রাত্রি এক প্রহরের পর মাধবগিরির কুটীর আক্রমণ করিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ কুটীরদ্বার ভগ্ন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যাহাকে সম্মুখে পাইল, নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। যোগানন্দের উপর তাহাদের আক্রোশ অধিক, সুতরাং তাঁহারই নির্য্যাতন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল, বলপূর্ব্বক তাঁহার মুখে গোমাংস পুরিয়া দিল। যোগানন্দ প্রহারের আধিক্যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, দেখিলেন মাধবগিরি তাঁহার শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেছেন। ব্রাহ্মণী অদূরে বসিয়া অশ্রুপ্রবাহে ধরাতল ভাসাইতেছেন। কাতরকণ্ঠে যোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়ন্তী কোথায়?"

কপালে করাঘাত করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"নাই—তাহারা লইয়া গিয়াছে।"

যোগানন্দ উঠিতে যাইতেছিলেন, মাধবগিরি নিষেধ করিয়া কহিলেন,—"কোথায় যাইবে—শত্রু প্রবল, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে কি করিবে? রাজবিচারেও সুফলের প্রত্যাশা কম! ভগবান একদিনে আমার সব কাড়িয়া লইলেন। জাতি, ধর্ম্ম, মান একদিনে অতল জলে ডুবিল!"

রাত্রির শেষ হইতে ব্রাহ্মণীর ঘন-ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। পরদিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় ব্রাহ্মণীর আবার জ্ঞান অপহৃত হইল—সেই শেষ। ব্রাহ্মণী সকল জ্বালা জুড়াইলেন। মর্ম্মপীড়িত, শোকসন্তপ্ত স্বামী-পুত্রের কর্ম্মের এখনও শেষ হয় নাই—সুতরাং তাঁহারা বাঁচিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণীর যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, মাধবগিরি শ্মশান হইতে

আর গৃহে ফিরিলেন না। যোগানন্দ পিতার অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোন স্থলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। জয়ন্তীর উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতেও বিন্দুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। জয়ন্তীর উপর জাফর খাঁর লালসা থাকিলেও, তাঁহাকে নবাবের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া, সকল বিপদের শান্তি করিলেন। নবাব অপহৃতা বন্দিনী-বিধবা জয়ন্তীর উচ্ছলিত-মাধুরী নিরীক্ষণে মুগ্ধ হইলেন। সুতরাং জাফর খাঁর অত্যাচারের আর কোনই প্রতি-বিধান হইল না। বিচারপ্রার্থী যোগানন্দের বিচরালয়ে প্রবেশের দ্বার ঐ স্থানেই রুদ্ধ হইল। পুনঃ-পুনঃ রাজ-বিচারের প্রার্থী হইলেও কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

এদিকে মাধবগিরি মনোদুঃখে কাতর হইয়া, সেই রাত্রেই নবাবের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। শ্মশান হইতে ফিরিবার পথে সহসা অদৃশ্য হইলেন! সমস্ত রাত্রি চলিলেন। যখন প্রভাত হইল, দেখিলেন এক প্রকাণ্ড অরণ্যানীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লোকালয় অপেক্ষা বিজন বিপিনই এখন তাঁহার স্পৃহনীয়। সুতরাং বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোন গন্তব্য স্থান নাই—কোথায় যাইতেছেন সে দিকেও ভ্রুক্ষেপ নাই। অর্দ্ধ-নিমী-লিত নেত্রে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে গুল্মলতা পদদলিত করিয়া ক্রমশঃ চলিতেছেন। নগ্নপদ বহিয়া রক্ত ছুটিতেছে—কণ্টকে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—তথাপি চলিতেছেন। এইভাবে বনপথে ভ্রমণ করিতে-করিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া অবশেষে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। শূন্যদৃষ্টিতে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"কাল এমন সময়ও আমার সব ছিল—আজ আর কিছু নাই। এ যে ছায়াবাজী

অপেক্ষাও কৌতুকোদ্দীপক! মানবাদৃষ্ট কি এতই পরিবর্ত্তনশীল! আমার স্ত্রী—আমার পুত্র—আমার বাগান—আমার বাড়ী—সব আছে—চক্ষের পলক ফেলিয়া চাহিয়া দেখি কিছুই নাই! বাহবা রে সংসার! ইহারই মায়ায় মানব এত উন্মত্ত! ঐশ্বর্য্যের এত গর্ব্ব! একটা ফুৎকারেরও যে ভর সয় না!"

ব্রাহ্মণ আপন মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বনময় তাঁহার হাস্যের একটা প্রতিধ্বনি শব্দ-তরঙ্গে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া দূর দূরান্তরে বিলীন হইয়া গেল। আবার তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমনসময়ে দুইজন বিকটাকার নরহন্তা লাঠিহস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বিঘূর্ণিত আরক্ত নয়ন দেখিলে অন্য সময়ে হয় ত তিনি ভয়ে সংজ্ঞা হারাইতেন। কিন্তু এখন তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বিপদের চরমাবস্থায় একবার মনে সাহসের সঞ্চার হয়। যখন আর অন্য উপায় থাকে না, লোকে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়ায়, তখন আঁধার গগনে চপলা বিকাশের মত, সাহসের জ্যোতিঃ একবার মনের মধ্যে বিভাসিত হয়। মাধবগিরি প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াছেন, সংসারে যাহা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব হারাইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে মৃত্যুর জন্য অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে কৃতান্তের সহচর তুল্য নরহন্তাদ্বয়কে সম্মুখে দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

দস্যুদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিল,—"ঠাকুর! অমন করিয়া হাসিতেছ কেন?"

মাধবগিরি কিয়ৎক্ষণ তাহাদের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"বলিতেছি কিন্তু আগে বল তোমরা কে?"

দস্যু। আমাদের চেহারা দেখিয়া বুঝিতেছ না, আমরা কে? আমরা দস্যু—লুণ্ঠন আমাদের পেশা।

মাধব। কিন্তু আমার নিকট ত ভাই! পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তবে যদি বল তোমার প্রাণ লইব—তাহাতেও আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

দস্যু। আমাদিগকে দেখিয়া তোমার ভয় হইতেছে না?

মাধব। কিসের ভয় হইবে? প্রাণের? তাহা আমার নাই।

দস্যু। কেন ঠাকুর! প্রাণে এত ধিক্কার জন্মিল কেন? সেই জন্যই বুঝি অত হাসিতেছিলে?

মাধব। হাঁ ভাই!

দস্যু। তোমার বাড়ী কোথা? সংসারে কে কে আছে?

মাধব। কাল এমন সময় আমার সব ছিল—কিন্তু আজ আর কিছুই নাই। বাড়ী ছিল—ঘর ছিল—পরিবার ছিল—পুত্র-কন্যা ছিল—মান-মর্য্যাদা সবই ছিল—আজ আর কিছুই নাই—এমন কি জাতি পর্য্যন্ত নাই।

দস্যু দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। তাহারা বোধ হয় ভাবিল, লোকটা পাগল। যে কারণেই হউক, তাহারা লাঠি দুই গাছা পার্শ্বে রাখিয়া উপবেশন করিল। মাধবগিরি তাহাদের মনোভাব অনুভবে বুঝিয়া কহিলেন,—"আমার কথায় বোধ হয়, তোমাদের প্রত্যয় হয় নাই—বোধ হয়, আমাকে পাগল বলিয়া ভাবিতেছ?"

দস্যু। না ঠাকুর! পাগল ভাবি নাই কিন্তু সব যদি ছিল—গেল কোথায়?

মাধব। ছায়াবাজীর মত নিমিষে সব ফুরাইয়া গেল। জাতি

গিয়াছে—মান-সম্ভ্রম গিয়াছে—পত্নী গিয়াছে—কন্যা গিয়াছে—পুত্রও বোধ হয় এতক্ষণ নাই।

দস্যু। ব্যাপারখানা কি খুলিয়া বলত।

মর্ম্মবেদনার কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিলে, দুঃখের কতকটা লাঘব হয়—তাহার তীব্রতা কতকটা সমতা প্রাপ্ত হয়; সেইজন্যই বোধ হয়, মাধবগিরি তাঁহার দুঃখের কাহিনী কিছুমাত্র গোপন না করিয়া আনুপূর্ব্বিক দস্যুদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া দস্যুদের পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইল। তাহারা কহিল,—"তাইত ঠাকুর! তবে এখন তুমি কি করিবে—কোথায় যাইবে?"

মাধব। যাইবার আর স্থান কোথায়! লোকালয়ে আর মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই।

দস্যু। তুমি আমাদের নিকট থাক। আমাদের কেহ দলপতি নাই—আমরা তোমার অধীন হইয়া থাকিব। আমাদের দলে আরও লোক আছে।

মাধবগিরি সহসা কোন উত্তর করিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন, অদৃষ্টের এ-ও এক তীব্র উপহাস। আজীবন ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন—শেষে দস্যুবৃত্তি করিতে হইবে? তাঁহাকে নীরব দেখিয়া দস্যু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাবিতেছ ঠাকুর?"

মাধব। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান—দৈব দুর্ব্বিপাকে আজ না হয় জাতি-ভ্রষ্ট, পতিত,—তাই বলিয়া দস্যুবৃত্তি করিব কি করিয়া?

দস্যু। ঠাকুর দস্যু সবাই। আমরা ছোট দস্যু—রাজা বড় দস্যু, এইমাত্র প্রভেদ। আমরা ছোট-ছোট অত্যাচার করি—দুই-একজনকে খুন করি—রাজা গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়—সহস্র-সহস্র লোকের রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া ধনরত্ন লুটিয়া আনে।

তাহাদের সেটা ধর্ম্ম—আমরা পেটের দায়ে এই কাজ করি, তাই অধর্ম্ম।

মাধব। তোমরা হিন্দু?

দস্যু। হাঁ, হিন্দু!

মাধব। আমি তোমাদের সর্দ্দারি করিতে পারি, যদি তোমরা আমার কথামত কার্য্য করিতে পার।

দস্যু। তোমার পরামর্শ ভিন্ন আমরা কোন কার্য্যই করিব না।

মাধব। উত্তম। তাহা হইলে শপথপূর্ব্বক স্বীকার কর—নীরিহ অসহায় হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিবে না। তাহারাও তোমাদের ভাই—বিপদে তাহাদিগের সহায় হইবে—তাহাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে।

দস্যু। ঠাকুর! আমাদের স্ত্রীপুত্র আছে—নিজের পেট আছে, চলিবে কি করিয়া?

মাধব। সে ভার আমার। তোমাদের যাহাতে সুখে সংসার চলে, আমি তাহার উপায় করিব।

দস্যু। উত্তম। আমরা রাজী। পেটের দায়েই ত আমরা এ কার্য্য করি।

মাধব। মুসলমানেরা আমাদের প্রতি কি কম অত্যাচার করিতেছে, তোমার স্বধর্ম্মী শত-শত নীরিহ হিন্দু-সন্তানকে জাতিভ্রষ্ট করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যার উপর কত অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, তোমরা আজি হইতে যদি সেই সকল অত্যাচারীর দণ্ড দিতে প্রস্তুত হও, বিপন্নকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হও—আমি তোমাদের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিব। অত্যাচারী হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক তাহাকে সংহার করিবে। নারীর প্রতি কোন অত্যা-

চার করিবে না। ধনবানের শস্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত করিয়া ক্ষুধিত বিপন্নকে দান করিবে—মর্ম্ম-পীড়িতের মর্ম্ম-বেদনা দূর করিবে—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, দস্যুবৃত্তির মধ্যেও সুখ আছে, পুণ্য আছে।

দস্যু। এ অতি উত্তম পরামর্শ। আমরা দুজন ত রাজী—দলের আর-আর সকলেও রাজী হইবে।

মাধব। শুদ্ধ তাহাই নয়, আমি অবকাশ মত তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। শাস্ত্রের গূঢ়-মর্ম্ম বুঝাইয়া দিব। তোমাদের সংসারে যাহাতে কোন কষ্ট না থাকে তাহার উপায় করিব। কিন্তু তোমাদিগকে সর্ব্বদা আমার শাসনে থাকিতে হইবে—আমার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিলে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। সুরাপান, পরস্ত্রীহরণ, অকারণ লোকের উপর নির্য্যাতন, আত্মকলহ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দস্যু। সব পারিব ঠাকুর কিন্তু একটু আধটু মদ না খাইলে খাটিব কেমন করিয়া—প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসিবে কেন?

হাসিয়া মাধবগিরি কহিলেন,—"সে ভারও আমার। বিনা-মদে যাহাতে তোমরা পরিশ্রম করিতে পার এবং স্ফূর্ত্তি পাও তাহারও আমি উপায় বিধান করিব। তোমাদিগকে আজই আমি মদ ছাড়িতে নিষেধ করিতেছি না—অল্পে-অল্পে অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছি। সন্ধ্যার পর দলের সকলে একত্র হইলে, এ বিষয়ে পরামর্শ করিব।

বনের মধ্যে একটী পুষ্করিণী ছিল। ব্রাহ্মণ স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন। দস্যুরা দুগ্ধ এবং ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল। আহারাদি করিয়া তিনি বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

সেই দিন অবধি মাধবগিরি দস্যুদলে আছেন। তাঁহার শিক্ষা

এবং দীক্ষাগুণে দস্যুদের স্বভাব ক্রমশঃ সংযত হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা দিনের বেলায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রামায়ণ, মহাভারতের বীরগণের উপাখ্যান শোনে, রাত্রে লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠিত দ্রব্য তিনি সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন, নিজে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। ক্রমশঃ তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা নানারূপ ছদ্মবেশে গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে—সন্ধান লইয়া আসিত। রাত্রে দলবদ্ধ দস্যু-সম্প্রদায় অত্যাচারীর গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিত। ক্রমশঃ তাহারা এমন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল যে, প্রহরী-বেষ্টিত নবাবের তহশীলখানা পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

মাধবগিরি তাঁহার উপর কৃত-অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হন নাই। জাফর খাঁ যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা ভুলিতে পারেন নাই। জাফর খাঁ মুসলমান—সেইজন্য সমস্ত মুসলমান তাঁহার শত্রু। একের অপরাধে সমস্ত জাতিকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কোন সুযোগে তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর পাইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। মানুষের চরিত্রের পরিবর্ত্তন—হেয় অধঃপতন এমনই ভাবে ঘটিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে মাধবগিরি সামান্য একটী জীবহিংসাকেও মহাপাতক বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তিনিই আজ নরশোণিতপাত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

তাঁহারই নিয়োজিত গুপ্তচরের মুখে জয়ন্তীর সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার উদ্ধারকল্পে কৃতসংকল্প হইলেন এবং যে ভাবে তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, পাঠক জ্ঞাত আছেন।

জয়ন্তী বনমধ্যে দস্যুদলেই পিতার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যোগানন্দের পরিণাম

আমরা যেসময়ের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, সেসময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগন বিদ্যুৎবহ্নি-বিস্ফুরিত মেঘজালে সমাচ্ছন্ন। ইংরাজ তখনও তথায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। ফরাসি একটু ভূমিলাভের আশায় প্রাণপণে লড়িতেছেন। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত রাজ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতেছে। এইরূপ দুর্য্যোগের সময়ে একদিন সন্ধ্যাকালে একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল, ইংরাজবাহিনী অগ্রসর হইতেছে—পথিমধ্যে লালুর দুর্গ তাঁহারা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। শুনিয়া নবাব হাসন উল্লা বিরক্তিভরে অধর দংশন করিলেন। তদ্দণ্ডেই সমরসভা আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

মেণ্-পরিচালিত ইংরাজবাহিনী হাসনঘর পর্ব্বতপাশের নিকট উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন করিল। পর্ব্বতের উপর হাসনঘর দুর্গ।

ক্রমশঃ রাত্রি হইতে লাগিল। অন্ধকার আসিয়া ধরাতল পরিব্যাপ্ত করিয়া বসিল। সৈন্যগণ পর্ব্বতমূলে প্রস্তরখণ্ডে অঙ্গ ঢালিয়া কেহ নিদ্রা যাইতে লাগিল—কেহবা স্তিমিতনয়নে সুদূর সাগরপারবাসিনী প্রণয়িনীর বিদায়কালীন বিষাদমাখা মুখচ্ছবি ভাবিয়া কাতর হইতে লাগিল। কেহবা কাহারও সহিত গল্প করিতেছে—কোনস্থানে দুই-চারিজন একত্র হইয়া রজনী-প্রভাতে কি ভাবে রণরঙ্গে মত্ত হইয়া

বিশ্বজয়ী ব্রিটিশের সম্ভ্রম রক্ষা করিবে, তাহারই আলোচনা করিতেছে।

পট্টাবাসের চারিদিকে আলোক জ্বলিতেছে। সতর্ক প্রহরী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দূরে—অতিদূরে—পর্ব্বতশিরেও আলোক জ্বলিতেছে। তদ্দর্শনে ইংরাজ-সেনানীও বুঝিলেন শত্রুসৈন্য সতর্ক, সজাগ রহিয়াছে। পর্ব্বত পথ দুর্গম, দুরারোহ। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া পর্ব্বতদুর্গ অধিকার করিবেন, তাহাই তিনি ভাবিতেছেন।

এদিকে অপর একটী বৃক্ষমূলে কাপ্তেন হার্ব্বাট এবং কর্ণেল ফিলিপ—দুইজন ইংরাজ সেনানী বসিয়া আপনাদের ভাবী-জীবনের পরিণাম আলোচনা করিতেছেন। উভয়েরই বয়োক্রম অতি অল্প—কেহই এখনও পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করেন নাই। উভয়েরই আকৃতি সুগঠিত, চক্ষু নীলোজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত, মুখাকৃতি বীরত্ব-ব্যঞ্জক এবং দৃষ্টি সততার পরিচায়ক। দুইজনেই বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছেন। দুই বন্ধুতে দুইখানি পত্র লিখিয়া, পরস্পরের নিকট রাখিয়া দিলেন। ভাবী যুদ্ধে দুইজনের মধ্যে যদি একজনের জীবনান্ত ঘটে, তাঁহা হইলে অপরে বন্ধুর পত্রখানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিবে।

পত্রলেখা শেষ হইলে, তাঁহারা অপর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে পর্ব্বতপথের নিকটবর্ত্তী প্রহরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে সেইদিকে ধাবিত হইলেন। প্রহরী কহিল,—"বোধ হয় শত্রু নিকটবর্ত্তী, আমি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি।"

সেনানীদ্বয় আর কালবিলম্ব না করিয়া, কতিপয় সৈন্যসঙ্গে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদের নৈশযাত্রা বিফল হইল না। তাঁহারা দুইজনকে বন্দী করিলেন।

জিজ্ঞাসিত হইয়া বন্দীগণ কহিল, তাহারা নবাবের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজপক্ষে যোগ দিতে আসিয়াছে। তাঁহারা আরও জানিতে পারিলেন, প্রায় বিংশতিসহস্র নবাবসৈন্য পর্ব্বতদুর্গে অবস্থান করিতেছে। সেনানীদ্বয় সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না; বন্দীদিগকে সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিয়া, সে রাত্রির মত বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

রাত্রে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। শর্ব্বরী শেষে বংশীশব্দে সকলে জাগিয়া উঠিল। হার্ব্বাট ও ফিলিপ পূর্ব্বেই সজ্জিত হইয়া সঙ্কেতধ্বনির অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেনাপতি বন্দীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া স্বয়ংই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। কহিলেন,—"ইহারা দুই জনেই পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিবে বলিতেছে। তোমরা প্রত্যেকে ইহাদের এক-একজনকে সঙ্গে লও। যদি বুঝিতে পার কেহ বিপথে চালিত করিতেছে কিংবা কোনরূপে সামান্যমাত্র বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাও, তৎক্ষণাৎ গুলি করিবে। দুইজনের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সুতরাং পরিণামও বিভিন্ন হওয়া সম্ভব। একজন অর্থলোভে স্বজাতিদ্রোহী হইয়াছে, অপর প্রতিহিংসাবশে আমাদের আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, সঙ্কেত পাইলে অগ্রসর হইও।"

সেনাপতি প্রস্থান করিলেন। সেনানীদ্বয় বন্দী দুইজনকে আর একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রথম কহিল,—"আমি পুরস্কারের লোভে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেনাপতি সাহেব আমাকে দুইশত টাকা দিবেন বলিয়াছেন।"

হার্ব্বাট কহিলেন,—"হাঁ, যদি তুমি বিশ্বাসের কার্য্য কর নিশ্চয় অর্থ পাইবে, নচেৎ তোমার পুরস্কার কি হইবে বুঝিতে পারিতেছ।"

১ম ব্যক্তি কহিল,—"যদি আমার বিশ্বাসঘাতকতা দেখিতে পান, তৎক্ষণাৎ আমাকে খণ্ড-খণ্ড করিবেন। আমি আপনাদিগকে নিরাপদে লইয়া যাইব,—সমস্ত পথ আমার উত্তমরূপ জানা আছে। সত্য-মিথ্যা উহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

এই বলিয়া ১ম ব্যক্তি দ্বিতীয় বন্দীর প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিল। সে ব্যক্তি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"একজন অপরের হইয়া সত্য-মিথ্যায় জবাবদিহি করিতে পারে না। যে অর্থলোভে স্বজাতি ত্যাগ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহার মত ভীরু স্বজাতিদ্রোহীর দ্বারা নিশ্চয় কোন মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে না। সাহেব! আমি উহার হইয়া জবাবদিহি করিতে পারিব না। আমাকে অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের সঙ্গে লউন, আমি আমার প্রতিহিংসার জন্য লড়িব।"

কাপ্তেনসাহেব তাহার কথা শুনিয়া কহিলেন,—"তাহাই হইবে। আমার সৈন্য অগ্রে যাইবে, তুমি আমার সঙ্গে থাক। কিন্তু মুসলমানের প্রতি তোমার এত আক্রোশ কেন? তোমাকে ত হিন্দু বলিয়া বোধ হইতেছে?"

২য় ব্যক্তি কহিল,—"হাঁ সাহেব! পূর্ব্বে আমি হিন্দুই ছিলাম—এখন আমি জাতিভ্রষ্ট, পতিত ব্রাহ্মণ। মুসলমানের অত্যাচারে আমার জাতি-ধর্ম্ম, মান-সম্ভ্রম সব গিয়াছে। পিতামাতা মরিয়াছে—ভগ্নী মুসলমান-গৃহে বন্দিনী। আমি অর্থলোভে আপনাদের দলভুক্ত হইতে আসি নাই। আসিয়াছি প্রতিশোধ লইতে। পিতামাতার পিপাসিত প্রেতাত্মার উদ্ধার করিতে। যদি স্বহস্তে একটীও যবনের রক্তপাত করিতে পারি, বুঝিব আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

সাহেব তাহার সকল কথা বুঝিলেন না। তবে এইমাত্র

বুঝিলেন, মুসলমানের প্রতি তাহার বিজাতীয় আক্রোশ। এইসময়ে পুনরায় তূর্য্যধ্বনি হইল। সঙ্কেত পাইয়া সৈন্যগণ স্ব-স্ব অধিনায়কের অধীনে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বদিকে আলোকের ছটা দেখা দিল। নবোৎসাহে ইংরাজ চমূ পর্ব্বতারোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পথ ক্রমশঃ জটিল এবং দুরারোহ হইয়া উঠিতে লাগিল। সাবধানে ইংরাজ-সেনা প্রায় একঘণ্টা অগ্রসর হইল। তথাপি কোন শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অবশেষে সকলে একটী উচ্চ পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পার্শ্ব দিয়া অতি অপ্রশস্ত পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সেই মর্ম্মপীড়িত হৃতধর্ম্ম যুবক সৈন্যসমূহকে ধীরে অগ্রসর হইতে বলিয়া, উন্মুক্ত তরবারিহস্তে অগ্রে ধাবিত হইল। সকলে দেখিল সে পর্ব্বত পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাপ্তেনসাহেবের পার্শ্বস্থ একজন সৈনিক বন্দুক তুলিয়া কহিল, —"এ বিশ্বাসঘাতক। আমি তাহাকে গুলি করি?"

সাহেব কহিলেন,—"না। তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস। যে অগ্রে দুর্গ-প্রাকারে উপস্থিত হইতে পারিবে, তাহার পদোন্নতি হইবে।"

আনন্দধ্বনি করিয়া ব্রিটিশ-সৈন্য অধ্যক্ষের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। মোড় ফিরিয়া দেখিল, যবন-সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করিয়া পর্ব্বত-প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান। প্রভাত-তপনের কাঞ্চন-রশ্মি তাহাদের শিরঃস্ত্রাণের উপর পড়িয়া ঝকমক করিতেছে—শাণিত অসি-ফলকের উপর পড়িয়া ক্রীড়া করিতেছে। ইংরাজ-সৈন্য অগ্রসর হইবামাত্র নবাব-সৈন্য গুলিবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। সে আঘাতে

কত অগ্রগামী শ্বেতযোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কেশরীবিক্রমে ইংরাজ-সৈন্য অগ্রসর হইল। সকলের অগ্রে সেই হৃতধর্ম্ম ব্রাহ্মণ যুবক। তাহার দৃঢ়করের কৃপাণাঘাতে একে-একে তিন-চারিজন মুসলমান ভূশয্যা গ্রহণ করিল। দেখিতে-দেখিতে সেইস্থান ইংরাজ-সৈন্যে পূর্ণ হইয়া গেল। নবাব-সেনা তাহাদের দুর্ব্বার-বিক্রম সহিতে না পারিয়া, পশ্চাৎ হটিতে লাগিল।

দুর্গজয়ের প্রথম প্রতিবন্ধক তিরোহিত হইল। অবিলম্বে সেনাপতি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং হার্ব্বার্টের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—"ঐ দেখ—ঐ পাহাড়ের উপর নবাব-সেনা সজ্জিত। উহাদের সঙ্গে তোপ আছে—আমাদের গোলন্দাজ-সৈন্যকে অগ্রসর হইতে আদেশ কর—ঐ উচ্চস্থানে কামান বসাইয়া, তোপ দাগিতে বল, নিশ্চয় এ যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে।"

সেনাপতির প্রত্যেক আদেশ প্রতিপালিত হইল। ইংরাজের বজ্রনাদী কামান মুহুর্মুহু গর্জ্জিতে লাগিল! পদাতিক সেনা ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী। তখন উভয়দল বন্দুক ফেলিয়া তরবারি গ্রহণ করিল। অকস্মাৎ সকলের চক্ষু সেই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইল। হার্ব্বার্ট দেখিলেন, যুবক বিপক্ষ হইতে একজন প্রতিযোদ্ধা বাছিয়া লইয়া তরবারি চালনা করিতেছেন। প্রতিযোদ্ধার পরিচ্ছদাদিতে তাহাকে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। উভয় পক্ষের অনেকেই রণে বিরত হইয়া, উভয়ের রণক্রীড়া দেখিতে লাগিল।

যুবক মুসলমান যোদ্ধাকে কহিল,—"জাফর খাঁ! নারকি! আজ তোর প্রায়শ্চিত্তের দিন উপস্থিত!"

জাফর খাঁ যুবকের ভীষণ আঘাতে পশ্চাতে সরিয়া, অসি উত্তোলন

করিয়া কহিলেন,—"যোগানন্দ! কাফের! বিশ্বাসঘাতকতার কি ফল দেখ।"

যোগানন্দ নবাব-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এতদূর আসিয়াছেন। তাহার পর রাত্রিকালে মুসলমান শিবির ত্যাগ করিয়া, ইংরাজ হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন।

জাফর খাঁর কথার উত্তর মুখে না দিয়া, যোগানন্দ অসিহস্তে পুনরায় ধাবিত হইলেন। দর্শকবৃন্দ নির্নিমিষনয়নে উভয়ের যুদ্ধ দেখিতেছেন। জাফর খাঁ সুশিক্ষিত, অসি পরিচালনে অভ্যস্ত কিন্তু ক্রোধের আধিক্যবশতঃ, যোগানন্দ তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইলেও, সকল সময়ে তাঁহার সকল আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

উভয়ে যুদ্ধ করিতে-করিতে পর্ব্বতের প্রান্তসীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বে এক সুগভীর খাত—নির্ঝর-নিঃসৃত সফেন জলরাশিতে পরিপূর্ণ। খাতের অপর পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতমালা। জাফর খাঁ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রোধোন্মত্ত যোগানন্দ অবসর পাইয়া ভীষণ বেগে তরবারি উত্তোলন করিলেন। যদি সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পদনিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড স্খলিত না হইত, তাহা হইলে, জাফর খাঁর জীবনরঙ্গমঞ্চে এইখানেই চিরদিনের মত যবনিকা পড়িত—জগতের ইতিহাসে তাঁহার অত্যাচারের কলঙ্ক-গাথা আর জলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইত না। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। পাহাড় ধসিয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে হতভাগ্য যোগানন্দও খাতে পতিত হইলেন। মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল—শতকণ্ঠ হায় কি হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হার্ব্বার্ট প্রসারিত করে তাঁহার সাহায্যার্থ

ধাবিত হইলেন। কিন্তু হায় কি দেখিলেন! ফেনিল শুভ্র সলিল-রাশি তর্-তর্ বেগে ক্রমনিম্ন-ভূমির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে! খাতের গভীরতা এবং জলকল্লোলের ভীষণতা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। যোগানন্দের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। সেনানী হতাশচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাফর খাঁ যোগানন্দের আঘাত হইতে রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কোথা হইতে একটী শাণিত তীর আসিয়া, তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিল। সকলে চারিদিকে চাহিল কিন্তু কেহই তীর-ক্ষেপণকারীকে দেখিতে পাইল না। তিনি আহত হইয়া পতিত হইবামাত্র, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। ব্রিটিশ-বাহিনী ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর মত সঙ্গিনহস্তে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল। তলোয়ার, গুলি, এবং সঙ্গিনের আঘাতে বহু হতভাগ্য প্রাণ হারাইল। অবশিষ্ট সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিজয়োন্মত্ত ইংরাজ-সৈন্য নব-উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে হাসনঘর পর্ব্বত-দুর্গের শীর্ষোপরি ইংরাজের বিজয়-কেতন উড়িতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসিনী

হরিহরপুরের জমিদার সপরিবারে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নাম হইয়াছে সুজা আলি। তিনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং সাহসী। নবাব তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বেতনোর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। সুজা আলি প্রভূক্ত ক্ষমতাপন্ন ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও, নবাবের অত্যাচার বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অহর্নিশ তাঁহার হৃদয় প্রতি-হিংসানলে দগ্ধ হইতেছিল। প্রবল-পরাক্রান্ত নবাবের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন অসম্ভব ভাবিয়া, নীরবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং মনে-মনে ভাবিতেছেন,—"কি ভয়ঙ্কর মূল্যে আজ আমাকে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইতে হইয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষের সনাতন ধর্ম্মের—নিজের আজন্মের বিশ্বাস এবং সংস্কারের পরিবর্ত্তে আজ আমি একটা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা! ইহাতে কি আমি সুখী? না। আমার এই অশান্তির যাহারা কারণ, আমার এই অধোগতির যাহারা সোপান, তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার কি আমার ক্ষমতা নাই? না, আমি দুর্ব্বল—সে বা তাহারা প্রবল পরাক্রান্ত! মাথা তুলিয়াছি কি মরিয়াছি!"

শেষ কয়টী কথা অত্যুচ্চস্বরে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমনি সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ

হইতে কে বলিল,—"আলি সাহেব! মরণের হাত এড়াইয়া কতকাল বাঁচিয়া থাকিবেন ?"

আলি সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী। পরিধানে গৈরিকবাস, হস্তে ত্রিশূল—কুন্তল-কলাপ আলুলায়িত। মুখে মৃদু হাস্যচ্ছটা। তপনের শেষ রশ্মিটুকু সন্ন্যাসিনীর মুখ-কমলের উপর পড়িয়া হাস্য করিতেছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা স্বর্গীয়ভাব বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

সুজা আলির দৃষ্টি সহসা তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইবামাত্র যুগপৎ ভয়ে এবং বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"তুমি কে মা ?"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—"আমি সন্ন্যাসিনী।"

সুজা। তাহা ত দেখিতে পাইতেছি। আমার এ পুরোদ্যানে সাধারণের গতিবিধি নাই, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে ?

সন্ন্যাসিনী। ফটক খোলা ছিল, সুতরাং প্রবেশের পক্ষে কোনই বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

সুজা। এখানে কি প্রয়োজন ?

সন্ন্যাসিনী। আপনারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আলি সাহেব! জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! মৃত্যুভয়ে কি আপনি সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইবেন ? আপনার চির-পোষিত আশা কি কার্য্যে পরিণত করিবেন না ?

সুজা। কি আমার আশা ?

সন্ন্যাসিনী। নবাব হাসন আলির উচ্ছেদ সাধন।

সুজা। মিথ্যাকথা! কে তুমি ? তুমি কি নবাবের গুপ্তচর ? কেন আমাকে ছলিতে আসিয়াছ ?

সন্ন্যাসিনী। আমি কাহারও চর নহি। আপনি কি এই মাত্র মনে-মনে নবাবের উচ্ছেদ কামনা করিতেছিলেন না?

সুজা। যদি বলি না।

সন্ন্যাসিনী। বুঝিব আপনি মিথ্যাবাদী। শুনুন আলি সাহেব! আমি আপনার মনোভাব জানি, আমার নিকট গোপন করিবার কোনই কারণ নাই। আমিও নবাবের শুভানুধ্যায়ী নহি। আপনি মুসলমান এবং সর্ব্ব-সম্পদ-মণ্ডিত হইলেও, আপনার পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আপনার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। যদি আপনি সম্মত হন, আমি আপনাকে সাহায্য করিতে পারি।

সুজা। তুমি আমায় সাহায্য করিবে! তুমি স্ত্রীলোক—সামান্যা সন্ন্যাসিনী! তোমার দ্বারা আমার কি উপকার হইবে?

সন্ন্যাসিনী। অনেক।

সুজা। তুমি সন্ন্যাসিনী—এ সব রাজনৈতিক ব্যাপারে তোমার সংশ্রব কেন? আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার ইহাতে কি স্বার্থ আছে!

সন্ন্যাসিনী। স্বার্থ যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। নবাব আমাদের উভয়েরই শত্রু। বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা আমার হৃদয়ে বলবতী থাকিলেও, আমি দুর্ব্বলা অবলা মাত্র। সেইজন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

সুজা। আমি কি সাহায্য করিব? আমার শক্তি কতটুকু? প্রবলের সহিত সংঘর্ষে মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইব।

সন্ন্যাসিনী। সকল কার্য্য কি বলে সিদ্ধ হয়? যে স্থলে বলে কুলায় না, সে স্থানে কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়। বিদেশী

ইংরাজের প্রভাব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে—আপনি তাহাদের শরণাপন্ন হউন। নবাবের সহিত তাঁহাদের বিবাদ চলিতেছে—নবাব একে-একে তাঁহার রাজ্যসম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এই সময়ে তাঁহাদের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক, মাথা তুলিয়া দাঁড়ান, উভয়ের সমবেত শক্তির নিকট নবাবের রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবে।

সুজা। তোমার সকল কথা শুনিলাম, তথাপি তোমায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। এ সকল যে কোন শত্রুর ষড়যন্ত্র নয় কেমন করিয়া বুঝিব! নিশ্চয় তুমি কোন শত্রুর সহকারিণী—আমি তোমায় বন্দিনী করিয়া রাখিব।

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া কহিলেন,—"চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন কিন্তু তাহাতে আপনার কি ইষ্টসিদ্ধ হইবে? আর বন্দিনী করিলে কতক্ষণই বা আবদ্ধা রাখিতে সমর্থ হইবেন!"

সুজা আলি তীব্রদৃষ্টিতে সন্ন্যাসিনীর মুখপানে চাহিলেন কিন্তু সে শান্ত গম্ভীরমুখমণ্ডলে ভয় বা সাহসের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। সহসা একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসিলেন,—"সত্য বল তুমি কি ঠাকুরের লোক?"

সন্ন্যাসিনী। যদি তাহাই হই, আপনার আপত্তি কি?"

সুজা। প্রথম দর্শনেই আপনাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছি। পুনরায় বলিতেছি কেন মা আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন? ঠাকুর অদ্ভুতকর্ম্মা লোক। তিনি দস্যুবৃত্তি করিলেও, আমি তাঁহাকে ভক্তি করি। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশের অনেক অত্যাচার স্রোতে বাধা পড়িয়াছে। যিনি যেমনই শক্তিশালী হউন, সহসা দুর্ব্বলের উপর আর অত্যাচার করিতে সাহস করেন না। তাঁহারও কি ইচ্ছা আমি ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করি?

সন্ন্যাসিনী। তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে আমি এখানে আসিয়াছি। আপনি সর্ব্বদা যে প্রতিহিংসা-বহ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছেন, তিনি তাহা অবগত আছেন।

সুজা। কাল আপনি আমার সহিত এই উদ্যানে এমনই সময়ে সাক্ষাৎ করিবেন। আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব।

জয়ন্তী বিদায় গ্রহণান্তে মাধবগিরির নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল বিষয় নিবেদন করিলেন।

লালুরদুর্গের পতনের পর ছয়মাস অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে মাধবগিরির দলে পঞ্চশতাধিক লোক যোগ দিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই সংসারী। চাষের সময় চাষ-আবাদ করে—অবসর পাইলে বনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রচালনা শিক্ষা করে। কেহ-কেহ বা রাজ-সরকারে কার্য্য করে,—গোপনে দেশ-বিদেশের সংবাদ আনিয়া দেয়। কোন স্থানে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে মাধবঠাকুরের দল, তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বলকে রক্ষা করে—অত্যাচারীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। দুই একবার নবাব-সৈন্যের সহিতও তাহাদের সামান্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে নবাব-সৈন্যই পরাস্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ কথাটা অতিরঞ্জিত হইয়া নবাবের কর্ণে উঠিল, তিনি সদলবলে মাধবগিরিকে বন্দী করিতে আদেশ প্রচার করিলেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার দল কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছে, কেহ তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যোগিনী

সুজা আলির আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া, ইংরাজ-সৈন্য বেতনোর দুর্গ আক্রমণ করিল। বলা বাহুল্য বিনা রক্তপাতে সেস্থান তাঁহাদের করতলগত হইল। সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। একদল প্রবল সৈন্য বিশ্বাসঘাতক সুজা আলিকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে বেতনোর অভিমুখে ধাবিত হইল।

সুজা আলি এখনও বেতনোরের শাসনকর্ত্তা। ইংরাজ তাঁহার সহায়। একদল ইংরাজ-সৈন্য দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। তথাপি নবাব-সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া, তিনি শঙ্কাতুর হইয়া পড়িলেন।

তালে খাঁ সেই অবধি ইংরাজ-শিবিরেই আছে। সেনাপতির বিশ্বাস তাহার উপর অগাধ, তিনি তাহার পরামর্শ ব্যতীত বড় একটী কোন কার্য্যই করেন না। হার্ব্বার্ট কিন্তু বরাবরই তাহার উপর সন্দিগ্ধ। একদিন হার্ব্বার্ট সেনাপতির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"জনরবে প্রকাশ দশ-সহস্র নবাব-সৈন্য বেতনোর অবরোধ করিতে আসিতেছে। এ-কথা সত্য হইলে, পূর্ব্বাহ্নে আমাদের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।"

হাসিয়া সেনাপতি কহিলেন,—"তালে খাঁর নিকট আমি সংবাদ পাইয়াছি, এ-সংবাদ সত্য নহে। নবাবের দশ-সহস্র সৈন্যই এখন

মজুত নাই। নবাব-সেনা আসিলেও দুই-সহস্রের অধিক আসিবে না। আমাদের শিক্ষিত-সৈন্যের সম্মুখে মুষ্টিমেয় শত্রু-সৈন্য কতক্ষণ দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে?"

হার্ব্বাট পুনরায় কহিলেন,—"দুর্গের অবস্থা ভাল নয়। উহার রীতিমত সংস্কার আবশ্যক।"

সেনাপতি হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুর্গ-সংস্কারের অর্থ কোথায়? দেশীয় সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া অসংযত হইয়া উঠিতেছে।"

হার্ব্বাট আর কোন কথা বলিলেন না। সে দিবস ঐ-ভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে বালার্কের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে দুর্গবাসী সকলে দেখিল পিপীলিকাশ্রেণীবৎ নবাব-সৈন্য দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। হার্ব্বাট দুর্গময় তালে গাঁর অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোনস্থানে তাহার কোনই নিদর্শন পাইলেন না। যথা-সময়ে সংবাদ সেনাপতির কর্ণগোচর হইল। তিনি বিরক্তিভরে অধর দংশন করিয়া কহিলেন,—"লোকটা শয়তান! আমি সম্পূর্ণ প্রতারিত হইয়াছি।"

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় নবাব-সৈন্য আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। সেনাপতি হার্ব্বাট এবং সুজা আলিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"দুর্গের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমরা অধিকদিন অবরোধ সহ্য করিতে পারিব না। গুলি-গোলাও আমাদের অধিক নাই—খাদ্য দ্রব্যেরও সম্পূর্ণ অভাব। হার্ব্বাট! অদ্য রাত্রিকালেই তুমি গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া পূর্ব্বপ্রাকার হইতে আক্রমণ আরম্ভ করিবে। আমি সুজা আলিকে লইয়া দক্ষিণ তোরণ হইতে বহির্গত হইব। শত্রু-প্রাচীর ভেদ করিয়া লালুর অভিমুখে যাত্রা করিব। শত্রু-

সেনার সংখ্যা পঞ্চ-সহস্রের অধিক হইবে না। কতক সৈন্য আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি অনায়াসে অবশিষ্ট শত্রুকে মথিত করিয়া লালুরে উপস্থিত হইতে পারিবে। সে গিরিদুর্গে অবস্থান করিয়া, আমরা অনায়াসে শত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিব। পরে মান্দ্রাজ হইতে নূতন সৈন্য আসিলে পুনরায় বেতনোর অধিকার করিয়া লইব।"

সেই যুক্তিই স্থির হইল। পথশ্রান্ত নবাব-সৈন্য বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতেছে, এমনসময়ে সহসা ইংরাজের বজ্রনাদী কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। ভীতিবিহ্বল নবাব-সৈন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইংরাজের গোলার আঘাতে কত যে ধরাশায়ী হইল, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সে-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। অবিলম্বে নবাব-সৈন্য সজ্জিত হইয়া ইংরাজের তোপের উত্তর দিতে আরম্ভ করিল। দলে-দলে নূতন সৈন্য আসিয়া, পূর্ব্বপ্রাকারের সম্মুখে জমা হইতে লাগিল।

এই অবসরে ইংরাজ সেনাপতি সুজা আলিকে সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণ তোরণ হইতে বহির্গত হইলেন। তাহার সঙ্গে পঞ্চশত মাত্র যোদ্ধা। তাঁহারা দুর্গ হইতে বহির্গত হইবামাত্র, প্রথমতঃ মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। ভীতত্রস্ত মুসলমানগণ পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল! তখন মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজ-সৈন্য চারিপার্শ্বে শত্রুধ্বংস করিতে-করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য ধরাশায়ী হইল। নবাব-সৈন্য মহোৎসাহে গর্জ্জিয়া উঠিল।

সেইসময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সহসা পার্শ্ববর্ত্তী একটী জঙ্গলের মধ্য হইতে একদল হিন্দু-যোদ্ধা বাহির হইয়া, "হর-হর ব্যোম-ব্যোম!" শব্দে নবাববাহিনীর উপর সিংহবিক্রমে পতিত হইল। এই আকস্মিক বিপদে নবাব-সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

হিন্দু-যোদ্ধার অগ্রভাগে গৈরিকবসনপরিহিত, আবক্ষ-শ্বেত-শ্মশ্রু-শোভিত এক দীর্ঘাকার পুরুষ। তাঁহার তরবারির ভীষণ আঘাতে ছিন্নমূল-কদলীর মত নবাব-সৈন্য পড়িতেছে। তাঁহার দীর্ঘ তরবারি চপলা-দীপ্তির মত বিঘূর্ণিত হইতেছে—বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে অসংখ্য যবনমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে।

কিন্তু সৈন্যদলমধ্যে কে ঐ রক্তাম্বরা বিম্বাধরা? কে ঐ বিদ্যুৎ-বরণী, ত্রিশূলধারিণী, আলুলায়িত কুন্তলা কামিনী? ললাটে রক্তচন্দনের লেখা—নয়নে বিষম-বহ্নিশিখা? দণ্ডকারণ্যে মহারণে মহাযোগিনীর মত যবন-সমরে ত্রিশূলকরে কে ঐ নৃত্য করিতেছে?

জয়ন্তী। জয়ন্তী রক্তপিপাসু যোগিনীর মত রণ-দুন্দুভির তালে-তালে নৃত্য করিতে-করিতে সৈন্য চালনা করিতেছেন। দস্যুরা তাঁহাকে দেবী বলিয়াই জানে—তাঁহাকে দেবীর মতই ভক্তি করে। তিনি শক্তিরূপা হইয়া মহাশক্তির মত আজি রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়াছেন। দস্যুসেনার অমিততেজ। যবনসৈন্য তাহাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না।

আর ঐ আবক্ষ-শ্বেত-শ্মশ্রু-শোভিত পুরুষ মাধবগিরি। এই প্রৌঢ় বয়সেও তাঁহার দেহে মত্ত-মাতঙ্গের বল। তিনি সদলবলে মুসলমান সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। সেই অবসরে ইংরাজ-সেনাপতি বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন।

রজনী প্রভাত প্রায়। লালুরদুর্গাভিমুখে পলায়নপর ইংরাজ-সৈন্য

শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া একস্থানে বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুজা আলি সেনাপতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"এই অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব সাহায্য না পাইলে, আমাদের সকলকে আজ ক্রুদ্ধ নবাবসেনার হস্তে প্রাণ দিতে হইত।"

সেনাপতি। উহারা কে?

সুজা। মাধবগিরির দস্যু সম্প্রদায়।

সেনাপতি। উহারাই কি সেই ঠাকুরের দল! আমি উহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছি।

সুজা। আজি ত স্বচক্ষে তাহাদের বীরত্ব দর্শন করিলেন। অস্ত্র-চালনা বা সাহসে উহারা কোনক্রমে আমাদের শিক্ষিত-সৈন্য অপেক্ষা হীন নহে।

এইসময়ে সহসা তথায় জয়ন্তী উপস্থিত হইল। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া, ইংরাজসেনা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব কহিলেন,—"এই বীরাঙ্গনা আমাদের অশেষ ধন্য-বাদের পাত্রী। আলি সাহেব! ঠাকুরের দলে এমন বীরনারী আর কতগুলি আছে?"

সুজা আলি উত্তর করিলেন,—"ঐ একটী মাত্র। উহারই প্ররোচনায় ঠাকুরের দল অদ্ভুতকর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছে। এই বীর্য্যবতী কামিনীর দৃষ্টান্তেই তাহারা রণোন্মাদে নাচিয়া উঠে।"

জয়ন্তী সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"সাহেব! এ বিশ্রামের স্থান নয়। লালুবদুর্গ এখনও বহুদূর। পশ্চাতে জল-স্রোতের মত নবাব-সৈন্য আসিতেছে, শীঘ্র এ-স্থান ত্যাগ কর।"

সুজা আলি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "না! সে-দিন আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই, তাই বলিয়াছিলাম, তুমি নারী,

তোমার দ্বারা আমার কি উপকার হইতে পারে? আমার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। এখন সন্তানের প্রতি কি আদেশ হয়?"

জয়ন্তী কহিলেন,—"এখন লালুর দুর্গাভিমুখে প্রস্থান কর। সময়ে আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

জয়ন্তী আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না। নিমিষের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা আর তথায় মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন বেলা দ্বিতীয়প্রহরের সময় লালুরের পার্ব্বত্য-দুর্গে উপস্থিত হইলেন।

হার্ব্বার্ট কিন্তু দুর্গ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর পর্য্যন্ত সমানতেজে যুদ্ধ করিলেন, পরিশেষে তাঁহার গুলি বারুদ নিঃশেষিত হইয়া আসিল। তখন তিনি প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাহাতেও নিস্তার পাইলেন না। নবাব-সৈন্য সোপান সাহায্যে দুর্গ-প্রাকারে আরোহণ করিল। অনর্থক রক্তপাত নিবারণার্থ হার্ব্বার্ট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রণক্লান্ত নবাব-সৈন্য দুর্গজয় করিয়া বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নদী-গর্ভে

বৈশাখ মাস। অপরাহ্নে তপনের প্রচণ্ডতেজ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। একদল অশ্বারোহী দাক্ষিণাপথের এক সমতল-ক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতেছে।

তাহাদের পুরোবর্ত্তী ব্যক্তির বেশ-ভূষা দেখিয়া তাঁহাকেই ঐ দলের অধিনায়ক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়োক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ। এক তেজস্বী, সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট।

অশ্বারোহীর বেশ-ভূষা বহুমূল্যের। মস্তকে হেম-খচিত উষ্ণীষ—অঙ্গে কৌশিকেয় বাস, তাহাতে কিনখাপের কাজ। কটিবন্ধে অসি দোদুল্যমান। অসিকোষ রত্নাদিমণ্ডিত। বামপার্শ্বে পিস্তল, দক্ষিণে সুশাণিত পরশু। বক্ষঃস্থলে অঙ্গস্ত্রাণের মধ্যে একখানি ছোরা এবং পৃষ্ঠদেশে বহুমূল্যের ঢাল।

তাঁহার পশ্চাতে ছয়জন অনুচর—তাঁহারই মত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সকলেই অশ্বারূঢ়। পার্থক্যের মধ্যে তাহাদের বেশ-ভূষা তত মূল্য-বান নহে।

এই অশ্বারোহীদলের পশ্চাতে একখানি শিবিকা—আটজন বাহকে অতিকষ্টে পথ বাহিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ছুটিতেছে। শিবি-কার পশ্চাতে ভারবাহী পাঁচটী উষ্ট্র। তাহাদের পশ্চাতে আরও চারি-পাঁচজন অনুচর কেহ অশ্বে, কেহ পদব্রজে আসিতেছে। সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া সকলেই দ্রুত চলিতেছে। সকলের

পশ্চাতে অতি সুশ্রী দুইটী তেজস্বী তুরঙ্গম—দুইজন সহিস ধরিয়া আনিতেছে।

পুরোবর্ত্তী ব্যক্তি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ইব্রাহিম! আমরা কাল বৈশাখীতে বাহির হইয়া ভাল কাজ করি নাই। দেখ আকাশে মেঘ ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে—মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎও প্রকাশ পাইতেছে। পথ ভাল নয়, সম্মুখে মনুষ্য-বাসের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। এরূপ স্থলে আমরা একা হইলে, ভয়ের তত কারণ থাকিত না—বিবি সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহার জন্যই আমি উদ্বিগ্ন হইতেছি। তুমি একবার এ-অঞ্চলে আসিয়াছিলে, তোমার বোধ হয় পথ জানা আছে?"

ইব্রাহিম বিনীতস্বরে কহিল,—"আসিয়াছিলাম সত্য কিন্তু তখন সৈন্যের সঙ্গে ছিলাম, পথের প্রতি তত লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ পাই নাই। শিবিকাবাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা বরঞ্চ অনেক সংবাদ দিতে পারে।"

প্রথম অশ্বারোহী সেইযুক্তিই সুযুক্তি স্থির করিয়া দাঁড়াইলেন, বাহকেরা নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদের সর্দ্দারকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোপাল! লোকালয় কতদূর? দেখিতেছ আকাশের দুর্য্যোগ ক্রমশঃই বাড়িতেছে।"

গোপাল সেলাম করিয়া কহিল,—"হজরৎ! নিকটের মধ্যে দুইটী লোকালয় আছে—একটী ঐ দেখুন।" অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া কহিল,—"ঐ দেখুন উচ্চভূমির উপর গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। অপরটী এখান হইতে দেড়-ক্রোশ কি কিছু বেশী। সেখানে বাজার হাট ও থাকিবার ভাল স্থান আছে। যদি বিবি সাহেব কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমরা পৌছাইয়া দিতে পারিব।"

অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং শিবিকার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার দ্বার ঈষৎ অপসারণপূর্ব্বক মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমিনা! তোমার অভিলাষ কি? যদি আর একটু কষ্ট স্বীকার করিতে পার, উত্তম বাসস্থান এবং উৎকৃষ্ট আহার্য্য পাওয়া যাইবে,—নচেৎ এই মাঠের মাঝখানে অনাবৃত স্থানে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে।"

সুহাসিনী শিবিকাবাসিনী হাসিয়া কহিলেন,—"আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। আপনার যদি কোন কষ্ট না হয়, এবং বাহকেরা যদি পারে, আমায় যেখানে লইয়া যাইবেন, আমার তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই।"

তখন সকলে দূর্ব্বাদলক্ষেত্রে বসিয়া, তাম্রকূট পানে শ্রান্তি অপনোদিত করিয়া, পুনরায় নবোদ্যমে যাত্রা করিল।

আকাশের অবস্থা ক্রমশঃই ভীষণভাব ধারণ করিতে লাগিল। দূরে—অতিদূরে তরুশিরে অনন্ত কৃষ্ণমেঘের শ্রেণী যেন জলভারে অবনত হইয়াই লম্বিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষবাজীর শ্যামপত্রের সান্ধ্য-দৃশ্যের সহিত বৈশাখী জলদপুঞ্জের কৃষ্ণ-কান্তির সমাবেশ এক অপূর্ব্ব ভীমকান্ত রূপের সৃষ্টি করিয়া দিল। সেই কৃষ্ণকান্তি নিবিড়-নীরদমালার কোলে কাশ-কুসুম-শুভ্র বলাকাশ্রেণীর সৌন্দর্য্য নয়ন ভরিয়া দেখিবার জিনিষ বটে কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি কাহারও নাই। সকলেই বিদ্যুল্লতার বিকাশে স্তম্ভিত, চকিত এবং ভীত হইয়া দ্রুতপদে লোকালয়াভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। আকাশের এই ভীষণ ভাব দেখিয়া, প্রকৃতিও যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সদাগতির গতিও যেন বন্ধ হইয়া গেল। বৃক্ষশিরে পত্রটী পর্য্যন্ত আর স্পন্দিত হইল না।

এক স্থূলোদর অশ্বারোহী অতিকষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"এরূপ যদি আর কিছুক্ষণ থাকে, আমি ত বাঁচিব না। আদৌ বাতাস নাই।"

তাহার পার্শ্বস্থ এক প্রবীণ যোদ্ধা কহিল,—"আর একটু অপেক্ষা কর, এত বাতাস পাইবে যে, 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতে হইবে। কর্ণাটের ঝড় কাহার অবিদিত আছে!"

অধিকক্ষণ আর বিলম্ব করিতে হইল না। দূরে শোঁ-শোঁ শব্দ হইতে লাগিল। মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ইব্রাহিম বেগে অশ্ব চালিত করিয়া, অগ্রগামী অশ্বারোহীর নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"খাঁ সাহেব! আমার স্মরণ হইতেছে, অদূরে ঐ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে একটী ভগ্নকুটীর আছে, চলুন তথায় আশ্রয় লই, নতুবা এই অনাবৃতস্থানে এ-ঝড়ে কাহারও নিস্তার নাই।"

খাঁ সাহেব ইব্রাহিমের কথানুসারে বৃক্ষপরিবৃত সেই ভগ্ন-কুটীরের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। বাহকেরা প্রাণপণ-যত্নে তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

দেখিতে-দেখিতে দুই-একটী করিয়া শাখালগ্ন শুষ্কপত্র আকাশে উড়িতে লাগিল। বায়ুমণ্ডল যেন কোনস্থলে এতক্ষণ আবদ্ধ ছিল। এক্ষণে মুক্ত হইয়া, পাঠশালের ছুটির পর দুষ্ট বালকের মত, চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ধূলিরাশি উড়িয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঘনান্ধকারে মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইল। খাঁ সাহেব পুনঃ-পুনঃ চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"যদি নিরাপদে ভগ্নকুটীরে শিবিকা লইয়া যাইতে পার, পাঁচটাকা পুরস্কার দিব।"

তুমুল ঝড় উঠিল। শিবিকামধ্যস্থা রমণী ভয়ে চীৎকার করিয়া

উঠিলেন। খাঁ সাহেব শশব্যস্তে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, —"ভয় কি! আমি তোমার নিকটেই আছি।"

শিবিকা আর চলে না। বাহকেরা আর সে প্রবল বাত্যার ভীষণ তাড়ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। শিবিকা হেলিতেছে-দুলিতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তে উল্টাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে। অকস্মাৎ এত বেগে ঘূর্ণাকারে প্রভঞ্জন বহিল যে, বাহকেরা তাহার সে প্রতাপ সহিতে না পারিয়া শিবিকাসমেত ভূতলে পতিত হইল। খাঁ সাহেব অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া ভীতিবিহ্বলা শিবিকারূঢ়ার নিকটে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার কোন স্থানে তেমন আঘাত লাগে নাই। খাঁ সাহেব হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন।

ঝটিকার বেগ প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়িতে লাগিল। আরোহীগণ অশ্বকে সংযত রাখিতে পারিল না। দলের কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাহার স্থিরতা নাই। ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে আরম্ভ হইল। উড্ডীয়মান ধূলিরাশি ক্রমশঃ ধরার বক্ষে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দেখিতে-দেখিতে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল—সঙ্গে-সঙ্গে ঝটিকার বেগও মন্দীভূত হইয়া আসিল।

প্রায় দুই-ঘণ্টাকাল সেইরূপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা পড়িয়া পুষ্করিণী নদী, বিল, মাঠ ভাসাইয়া দিল। বর্ষণ কমিলে সকলে খাঁ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল।

মাঠে এত জল জমিয়াছে যে, পথ চিনিয়া যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। মেঘাবৃত সন্ধ্যার অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই প্রবহমান আবিল জলরাশি হিল্লোলে-হিল্লোলে দুলিতেছে। বাহকেরা অতি

সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব ইব্রাহিমকে দেখিতে না পাইয়া, তাহার বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন. সকলে মিলিয়া তাহার নামোল্লেখ করিয়া বার-বার ডাকিল। কিন্তু প্রতিধ্বনি ভিন্ন অন্য কেহ তাহার উত্তর দিল না। অগত্যা খাঁ সাহেব অগ্রসর হইলেন। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলেন, হতভাগ্য ইব্রাহিম বজ্রাহত হইয়া এক বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে।

সকলে ইব্রাহিমের জন্য শোক-প্রকাশ করিতে-করিতে সেই ক্ষুদ্রগ্রামে উপস্থিত হইল। সেস্থলে মাত্র চারি-পাঁচঘর লোকের বসতি। তাঁহাদের রাত্রিবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। খাঁ সাহেব গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে একজনকে পথপ্রদর্শক লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। সে ব্যক্তি একটী মশাল লইয়া অগ্রে-অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বাতাসের ঝাপটায় আলোকটী নিভিয়া গেল। আবার সে আঁধার, সেই আঁধার।

তখন মশালের আশা ত্যাগ করিয়া, চপলালোকে পথ দেখিয়া অগ্রসর হওয়াই স্থির হইল। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কতদূর ?"

পথপ্রদর্শক কহিল,—"হুজুর ! আর অধিক দূর নাই—ঐ-আলোক দেখা যাইতেছে। মাঝে একটা সামান্য নদীমাত্র।"

নদীর নাম শুনিয়া খাঁ সাহেবের প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিলেন,—"সামান্য নদী ! মাঠের উপরেই যখন এত জল, না জানি নদীতে কত তুফানই হইয়াছে ! আল্লা ! এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন।"

তাঁহারা যতই নদীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, জল-কল্লোলের ভীষণশব্দ ততই তাঁহাদের কর্ণকুহরে স্পষ্টীকৃত হইতে লাগিল। নদীতটে আসিয়া তাহার ভয়াবহ ভাব দেখিয়া সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল।

খাঁ সাহেব কুপিত হইয়া পথ-প্রদর্শককে কহিলেন,—"কাফের! বিশ্বাসঘাতক! এই তোর সামান্য নদী?"

সে-ব্যক্তি যুক্তকরে কহিল,—"বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে নদীতে এক হাঁটুর বেশী জল ছিল না। বৃষ্টির জলে জল বাড়িয়াছে। নদী খুব প্রশস্ত বটে কিন্তু ইহার গভীরতা বেশী নয়। একজনকে আমার সঙ্গে দিন, আমি পার হইয়া দেখিয়া আসি কত জল বাড়িয়াছে।"

অন্ধকার রাত্রে কেহই নদীগর্ভে নামিতে সাহস করিল না। তখন পথ-প্রদর্শক একাই নদীতে নামিয়া পড়িল। নদীর গভীরতা তত বেশী নয়—চতুষ্পার্শ্ব হইতে জলপ্রবাহ আসিয়া নদীতে পড়িয়াছে। সেই জলে জল বাড়িয়া, সফেন আবিল জলরাশি কল-কল নাদে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছে।

পথ-প্রদর্শক পরপারে উত্তীর্ণ হইলে, খাঁ সাহেব কহিলেন,—"তুমি গ্রামে গিয়া আলোক এবং জনকয়েক লোক লইয়া আইস।" তদনুসারে সেই ব্যক্তি গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, দুই-তিনটী মশাল এবং কয়েকজন লোক সংগ্রহ করিয়া অনতিবিলম্বে নদীতটে উপস্থিত হইল।

খাঁ সাহেব পাল্কীর দ্বার খুলিয়া, বাহকদিগকে সাবধানে নদী পার হইতে আদেশ করিলেন। অগ্রে-অগ্রে দুইজন পথ দেখাইয়া চলিল। নদীর মধ্যস্থলে জল কিছু বেশী—বাহকেরা পাল্কি তুলিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইল। তাহাদের এত সাবধানতা সত্ত্বেও পুরোবর্ত্তী বাহক জল-তলস্থ বৃক্ষকাণ্ডে পদপ্রতিহত হওয়াতে, তাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। অপরাপর বাহকেরাও বে-সামাল হইয়া পড়িল। শিবিকা জলে ডুবিল। রমণী আর্ত্তনাদ করিয়া

উঠিলেন। খাঁ সাহেব অশ্ব হইতে জলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। বাহকেরা তাঁহাকে ধরিয়া না তুলিলে, নদীর প্রবলস্রোতের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারও জীবন নষ্ট হইত।

সকলে ধরাধরি করিয়া যখন তাঁহাকে নদীর অপর তটে উত্তোলন করিল, তখন তাঁহার চৈতন্য লুপ্তপ্রায়। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে গ্রামের মধ্যে লইয়া গিয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

সুন্দরী দর্শনে

সকলেই ভয়চকিত—স্তম্ভিত—ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য। তীরবর্ত্তী লোকগুলা কেবল আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জলে নামিয়া নিমগ্না রমণীর উদ্ধারসাধনে কাহারও সাহস হইল না।

এক যুবক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবিকাসহ রমণী জলমগ্না হইবামাত্র, তিনি স্বকীয় জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, নদী-তরঙ্গে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। সকলে 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যুবক দুইহস্তে তরঙ্গ ঠেলিয়া, উচ্ছ্বসিত জলরাশির ভীষণ-আঘাত বক্ষে ধরিয়া, নষ্টপ্রায় যুবতীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ ক্রোড়ে করিয়া তীরে উঠিলেন এবং ত্বরিতহস্তে যুবতীর মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার বৃদ্ধা মাতা চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"কাসিম আলি! এ কি? সুন্দরী—যুবতী! কোথা হইতে কাহাকে আনিলে?"

কাসিম আলি সংক্ষেপে মাতাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন,—"শীঘ্র আগুন জ্বালিয়া সেক দাও—একখানা শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া দাও—এখনি চৈতন্য হইবে! আহা কি সুন্দর চেহারা! যেন পরী! তোমরা ইঁহার সেবা কর, আমি খাঁ সাহেবকে সংবাদ দিয়া আসি।"

কাসিম আলি চলিয়া গেলেন। পুরকামিনীরা মিলিয়া জ্ঞানাপহৃতা যুবতীর চৈতন্য সম্পাদনে নিযুক্তা হইলেন। শীঘ্রই ললনার চৈতন্য সম্পাদিত হইল। যুবতী পদ্মনেত্র উন্মীলিত করিয়া চাহিলেন। সকলের আশঙ্কা দূর হইল। কাসিমের মাতা আর্দ্রবস্ত্র ছাড়াইয়া একখানি শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া দিলেন এবং খানিকটা গরম দুগ্ধ তাঁহার মুখের নিকট ধরিলেন।

এদিকে খাঁ সাহেবেরও চৈতন্য হইল। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইবামাত্র খাঁ সাহেব উন্মত্তের ন্যায় নদীর অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। মধ্যপথে কাসিম আলি আসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন,—"ফিরিয়া আসুন, আপনার পত্নী জীবিত। তিনি নিরাপদে আমার বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।"

কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। ক্ষিপ্তের মত কহিলেন,—"কে তুমি? কেন আমার সহিত প্রতারণা করিতেছ? সত্য করিয়া বলিতেছ,—আমার স্ত্রী জীবিত?"

বিনীতস্বরে কাসিম আলি কহিলেন,—"হাঁ জীবিত।"

"জীবিত!"—উৎকট আনন্দে বিহ্বল হইয়া খাঁ সাহেব কহিলেন,—"জীবিত! সলিল-সমাধি হইতে আমিনা রক্ষা পাইয়াছে! কে তাহাকে রক্ষা করিল?"

পার্শ্ববর্ত্তী দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি কহিল,—"কাসিম আলি—এই গ্রামের পত্তনিদার। তিনি সেইসময়ে নদীতটে উপস্থিত ছিলেন,

আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া, নদীগর্ভ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই তিনি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

খাঁ সাহেব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছ? তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে? তিনি কোথায়?"

কাসিম আলি নম্রস্বরে কহিলেন,—"আল্লা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। আমার মত দরিদ্রের কুটীরে আমেদাবাদের অধীশ্বরের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি আবদুল রহমন খাঁর স্ত্রীর এরূপ অবস্থায় যতদূর সেবা-যত্ন হওয়া সম্ভব, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না।"

আবদুল রহমন খাঁ পত্নীর পুনর্জ্জীবনলাভে হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। নষ্টবস্তুর পুনরুদ্ধারে মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা সকলের জ্ঞাতব্য নয়। রহমন খাঁ আপনার উচ্চপদ, মান-সম্ভ্রম, অতুল ঐশ্বর্য্য সকলিই ভুলিয়া গেলেন। কাসিমকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতেও যেন তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না—মনে শান্তি পাইলেন না। তিনি তাঁহার পদযুগল বেষ্টন করিয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন। বাধা দিয়া কাসিম কহিলেন,—"খাঁ সাহেব! আমি এমন কিছুই করি নাই, যাহার জন্য আপনি আমার নিকট এতদূর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় মনুষ্যমাত্রেরই যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার অতিরিক্ত কিছুই করি নাই।"

রহমন খাঁ কাসিমের নম্রতায় বশীভূত হইয়া পড়িলেন। আনন্দোৎফুল্লনয়নে তাঁহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহার সুন্দর, সুগঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কাসিমের বয়োক্রম এখনও দ্বাবিংশে পদার্পণ করে নাই। সুন্দর মুখে

শ্মশ্রুগুম্ফের সমাবেশ এখনও ভাল করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। ঈষৎ-রেখামাত্র পড়িয়াছে। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন তাহার শোভা— ঐ ঈষৎ-পরিস্ফুট কৃষ্ণরেখাও তেমনই তাঁহার মুখসৌন্দর্য্যের হ্রাস করিতে না পারিয়া বরং আরও বৃদ্ধিই করিয়াছে। তাঁহার প্রশস্ত ললাট—উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত আয়তনেত্র—বিশাল বক্ষঃস্থল খাঁ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

কাসিম আলি সানুচর রহমন খাঁকে তাঁহার আলয়ে লইয়া আতিথ্য-সংকারে পরিতুষ্ট করিলেন। জলমগ্না সুন্দরী সুখে নিদ্রা যাইতেছেন শুনিয়া, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনিও আহারাদি করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে কাসিম আলি তাঁহার প্রকোষ্ঠে আসিয়া শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা আসিল না। সন্ধ্যার যাবতীয় ঘটনা একে-একে তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতে লাগিল। সলিল-কান্তার অতিক্রম করিয়া খাঁ সাহেব প্রভৃতির নদীতটে আগমন—আবিল সলিলরাশির তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিতে-নাচিতে কল-কলনাদে উত্থান-পতন—বাহকস্কন্ধে শিবিকা-রূঢ়া সুন্দরীর প্রবাহিনী পার হইবার প্রয়াস—পদস্খলনে শিবিকাসমেত সকলের জলমধ্যে নিমজ্জন—গগন-পবনপূর্ণ করিয়া যুবতীর করুণ আর্ত্তনাদ—আবদুল রহমনের রোদন—উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হা-হুতাশ—শেষে তাঁহার নিজের নদীগর্ভে লম্ফপ্রদান এবং জ্ঞানাপহৃতা যুবতীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া, স্বীয় ভবনে আনয়ন প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটীর পর একটী তাঁহার মানস-পটে অঙ্কিত হইতে লাগিল। সকল চরিত্র অপেক্ষা, জলসিক্তা যুবতীর

অনুপম রূপ-লাবণ্য তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইল। তিনি অনন্য-চিত্ত হইয়া কেবলই সুন্দরীর সেই সুন্দর মুখখানির অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। মুদিতনয়নে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন,—"কি সুন্দর! জলসিক্ত প্রভাত-পদ্মের মত তাহার মুখখানি কি অনিন্দ্য! শৈবালগুচ্ছবেষ্টিত শারদ্ কমলের মত আর্দ্র-কুন্তলের মধ্যে মুখখানি কি সুন্দর! বর্ষাবারিবিধৌত পঙ্কজিনীর মত জলসিক্ত সুন্দরীর মুখকমলের কি অপূর্ব্ব মাধুরী। দীপালোকে একবার মাত্র সেই মুখখানি দেখিয়াছি। তেমন সুশ্রী-মুখ, তেমন সরস-ওষ্ঠ—তেমন পদ্মের মত নেত্র আমি কখনও দেখি নাই! তেমন মধুর কান্তি আমার চক্ষে আর কখনও পড়ে নাই! শরদুৎফুল্ল প্রভাত-পদ্মেও বুঝি তেমন মাধুর্য্য নাই। বর্ষাগমে-পুষ্টা সলিল-সম্ভারে-হৃষ্টা নদী জলেও বুঝি বা অমন লাবণ্য-ক্রীড়া করে না। মরি-মরি কি অপরূপ-রূপ। রূপসী বয়সে ষোড়শী। ঐ ভুবনমোহিনী সুন্দরী—ঐ যৌবনলালসোন্মদা ষোড়শী কামিনী—ঐ বৃদ্ধের অঙ্কশোভিনী! বিশ্ব-বিধাতার কি বিচিত্রলীলা! কে যেন আমার কানে-কানে বলিতেছে, উহার সহিত আমার জীবনের কোন নৈকট্যসম্বন্ধ আছে।"

এইসময়ে পার্শ্বের গৃহ হইতে কথোপকথনের শব্দ তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, নিদ্রোত্থিতা রহমন পত্নী তাঁহার মাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর! যেন নীরবনিশীথে বীণার ঝঙ্কার।

তাঁহার মাতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া, যুবতী আত্মপরিচয় বিবৃত করিতেছেন। সে কথোপকথনের সার-মর্ম্ম, খাঁ সাহেবের বাস,

তাঁহার পিত্রালয়ের অদূরে। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে খাঁ সাহেব কয়েকমাসের অবসর লইয়া জন্মভূমি দর্শনে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পিতামাতাকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাঁহার পানিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অবকাশকাল এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই কিন্তু আমেদাবাদ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে, নবাবসাহেব তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন,—তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, আমেদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

ক্রমশঃ তাঁহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কাসিমও পুনরায় তাঁহার শয্যায় শয়ন করিলেন—বহু সাধ্য-সাধনা করিলেন কিন্তু কিছুতেই নিদ্রার আবির্ভাব হইল না। তাঁহার বিনিদ্র-নয়নপ্রান্তে যুবতীর শারদ-শশাঙ্কসদৃশ সুন্দরানন, পক্কবিম্বতুল্য ওষ্ঠাধর, পদ্মপর্ণনিভ বিশালনয়ন কেবলই সমুপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার চিন্তাপ্লাবিত পঙ্কিল হৃদয়সরে যুবতীর মূর্চ্ছামলিন কমনীয় নলিনমুখখানি থাকিয়া-থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। কাসিম আলি উদ্বিগ্ন হইলেন। সুখশয্যা কণ্টকময়ী হইল। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—ধীরে-ধীরে বাটীর বাহির হইলেন।

আকাশ এখন বেশ পরিষ্কার হইয়াছে—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। কেবল দুই-একখানা বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড রণশেষে পরাজিত, যূথভ্রষ্ট সৈন্যের ন্যায় এখনও এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। জলসিক্ত পাদপপুঞ্জের উপর চন্দ্রমার ধবলরশ্মি পতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। ধরাবক্ষে সে রজতশুভ্র করজাল পড়িয়া অশ্রুসিক্ত সুন্দরীর মুখকমলে হাস্যলীলার মত ক্রীড়া করিতেছিল। কাসিম আলি বাহিরে অনেকক্ষণ হাস্যময়ী প্রকৃতির দিকে চাহিয়া রহিলেন

কিন্তু তাহার মনোহারিণী মাধুরীতেও তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না। তিনি কতকটা উদ্ভ্রান্তচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোথায়? তাহার স্থিরতা নাই। অবশেষে নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তুঙ্গভদ্রা এখনও সেইরূপ তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া-নাচিয়া আবিল জলরাশি বক্ষে ধরিয়া তর্‌তর্ বেগে ছুটিতেছে। চন্দ্রকরমালা তাহার উপর পড়িয়া মধুরহাসি হাসিতেছে।

কাসিম আলি ভাবিতে লাগিলেন,—"এইস্থানে এই নদীর সমাধিগর্ভ হইতে তাঁহার উদ্ধার করিয়াছি—এইস্থানেই প্রথমে মশালের আলোকে প্রদোষপদ্মবৎ মুখপদ্ম প্রথমে দেখিয়াছি। তখন সে মূর্চ্ছিত—ভাস্করনির্ম্মিত প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় জীবনহীন—তখন সে নয়ন-সরোজ নিমীলিত—তাহাতে পলক দেখি নাই—সে বিশাল নীলেন্দীবর নয়নে লালসাচঞ্চল বিক্ষেপ দেখি নাই। জলসিক্ত, সরস বিম্বোষ্ঠ স্থির দেখিয়াছি,—তাহারই কত সৌন্দর্য্য—কত শোভা —কত মনোহারিত্ব। না জানি সেই পদ্মনেত্রের উন্মেষ হইলে কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে—জীবনীশক্তির সঞ্চারে বিম্বাধর কাঁপিয়া উঠিলে, প্রবালের উপর সুধাকরের রশ্মি প্রপাতের মত, তাহাতে মৃদু-হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিলে, না জানি সৌন্দর্য্য-সাগরে কতই মাধুর্য্যের কি চাঞ্চল্যই ছড়াইয়া দিবে। মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এই চন্দ্রকরপ্লাবিত আকাশের তলে এই নদীতটে তাহার হাত ধরিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিতে-চাহিতে বেড়াইতে পাইতাম, তাহা হইলে জীবন সার্থক মনে করিতাম। কিন্তু হায় এ সকল স্বপ্ন! তাহার স্বামী বর্ত্তমান—যেমন-তেমন স্বামী নয়, রাজ্যেশ্বরের শক্তিমান সেনাপতি। তবে বৃদ্ধ—তথাপি সে তাহার পরিণীতা পত্নী। আমি তাহার

কে? কেন তাহার চিন্তায় এতদূর আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি? এ পাপ-কল্পনা কেন হৃদয় জুড়িয়া বসিতে চায়? কিছুই ত বুঝিতে পারি না!"

কাসিম বাটীর দিকে ফিরিলেন। সকলের অজ্ঞাতে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা আসিল কিন্তু চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। স্বপ্নেও সেই মূর্ত্তি—সেই নদীতটে মশালের আলোকে সেই সুষুপ্ত সুখ-সৌন্দর্য্য!

দশম পরিচ্ছেদ

পথে

রজনী প্রভাত হইলে আবদুল রহমন অন্তঃপুরে তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে সুস্থ এবং নিরাপদ দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। গত রজনীর দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

যুবতী কহিলেন,—"পাল্কী যখন জলে পড়িয়া যায়, আমি চীৎকার করিয়াছিলাম, তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, আমি জানি না। যখন আমার চৈতন্য হইল, দেখিলাম এইস্থানে এই শয্যায় শুইয়া আছি। আমার পার্শ্বে দুইটী স্ত্রীলোক,—একজন শুষ্কবস্ত্রদ্বারা আমার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতেছে। অপর আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া দিতেছে। শুনিলাম নদী পার হইবার সময় কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল—এ-কথা কি সত্য?"

আবদুল রহমান কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"হাঁ প্রিয়তমে! বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কাসিমের মা অতি বুদ্ধিমতী, প্রকৃত বিষয় তোমার নিকট অপ্রকাশিত রাখিয়া ভালই করিয়াছেন। তুমি জল-

মগ্ন হইয়াছিলে—আমার বহু পুণ্যের জোর, তাই আবার তোমায় পাইয়াছি।"

যুবতীর মুখ শুখাইয়া গেল, কাতরস্বরে কহিলেন,—"তাহা হইলে মৃত্যুকবল হইতে কাল আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন? আমার জন্য কাল আপনার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাঁ সাহেব কহিলেন,—"না আমিনা! আমার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটে নাই! আমি তোমার উদ্ধারার্থ নদীতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম সত্য কিন্তু অনুচরবর্গ আমাকে ধরিয়া না তুলিলে আমি প্রবলস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম।"

বিশুষ্কমুখে আমিনা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কে আমাকে রক্ষা করিল?"

খাঁ সাহেব তখন সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া আমিনা অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আহা ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন। আপনি তাহাকে কিছু পুরস্কার দিবেন।"

"কিছু পুরস্কার কি আমিনা!"—সাগ্রহে খাঁ সাহেব কহিলেন, —"কিছু পুরস্কার কি আমিনা! যদি কাসিম গ্রহণ করে, আমি তাঁহাকে আমার বিষয়ের অর্দ্ধেক দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমিনা! তাহার স্বভাব যেরূপ উদার—চরিত্র যে প্রকার উন্নত,— আমি তাহাকে পুরস্কারের কথা বলিতে সাহসই করিব না।"

খাঁ-পত্নী কহিলেন,—"আমিও আমার সমস্ত হীরকালঙ্কার তাহাকে দিতে প্রস্তুত আছি।"

মাথা নাড়িয়া, খাঁ সাহেব কহিলেন,—"তাহাও সে লইবে না। এখনও সে অবিবাহিত।"

বিস্ময়ে আমিনা কহিলেন,—"অবিবাহিত! এখনও বিবাহ হয়

নাই!" তাঁহার অজ্ঞাতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। খাঁ সাহেব বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার সময় সুযোগ পাইয়া, রহমন খাঁ কাসিম আলিকে তাঁহার মনোভিপ্রায় বিদিত করিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে, এবং সৈনিকবিভাগে একটী কর্ম্ম করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শুনিয়া আহ্লাদে কাসিম কহিলেন,—"আপনি আমার সম্মুখে উচ্চাকাঙ্ক্ষার যে চিত্র অঙ্কিত করিলেন, ও-সকল যৌবনের সুখস্বপ্ন বটে কিন্তু আমার মত অসহায় ক্ষুদ্রব্যক্তির নিকট দুরাশা মাত্র।"

গম্ভীরস্বরে খাঁ সাহেব কহিলেন,—"দুরাশা নয় ভাই! হায়দার আলি কি ছিল—তাহার পূর্ব্বপুরুষ কি-কি ছিল, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? একজন সামান্য পাঞ্জাবী ফকির—তোমার ত উচ্চবংশে জন্ম। তুমি চেষ্টা করিলে না হইতে পারে কি? তোমার ভাগ্য তোমাকে পরিচালিত করিবে। আমি তোমার বিস্তৃত ললাটে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত দেখিতেছি! তুমি জান আমি আমেদাবাদপতির অশ্বারোহীর দলের অধিনেতা—নবাব-সরকারে আমার বিশেষ-প্রতিপত্তি আছে। আমি তোমাকে নবাবের নিকট লইয়া গিয়া, তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দিব। তোমার দেহের গঠন সৈনিকপুরুষের ন্যায়—তোমার মুখাবয়বে সাহসের দীপ্তি প্রস্ফুট রহিয়াছে—বীরত্বের বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় তোমার বদনে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এতগুলি সৎগুণ আল্লা তোমাকে বৃথা দেন নাই। সংসারের শতবাধা অতিক্রম করিয়া, বিঘ্ন-বিপ্লবের পঙ্কিল সলিলের তরঙ্গাভিঘাত বক্ষঃ পাতিয়া লইয়া—অসি চর্ম্মহস্তে শোণিতহ্রদে ঝম্প দিয়া, কীর্ত্তির নিশান উড়াইতে তোমার

জন্ম হইয়াছে—চল, তুমি আমার সহিত চল—তোমার উন্নতি বা।”

খাঁ সাহেবের কথা শুনিয়া যুবক কাসিম আলির হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। নিজের গুণগরিমার প্রশংসা—ভবিষ্য-জীবনের সুখময়ী কল্পনা কাহার হৃদয়কে না বিলোড়িত করে? ·

বাল্যকালে কাসিমের পিতার মৃত্যু হয়। তিনি নিজাম আলির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার বাহুবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি মারহাট্টা ও দাক্ষিণাপথের হিন্দুদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—সেইজন্য তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া, নিজাম তাঁহাকে এই গ্রামটী প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি উহা তাঁহাদেরই অধিকারে আছে। সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিতৃপদের অনুসরণ করিতে কাসি[illegible] বরাবরই বাসনা। এতদ্দিন, তাঁহার সুযোগ ঘটে নাই। এক্ষণে খাঁ সাহেবের মুখে সেই চিরপোষিত আশার পোষকতার সুসংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বিনীতভাবে খাঁ সাহেবের নিকট তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

কাসিমের মাতা প্রথমতঃ একমাত্র পুত্রের বিদেশ গমনে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পুত্রের আগ্রহাতিশয্যদর্শনে শেষে তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের যাত্রা করা স্থির হইল।

প্রত্যুষে সকলে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল। কাসিম বেশভূষা করিয়া বহির্গত হইলেন। যে দুইটী অতিরিক্ত অশ্ব সহিসেরা লইয়া আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট, কাসিম তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসিলেন। তাঁহার স্বভাবসুন্দর আকৃতি একে মনোরম, আজ আবার সুন্দর বীরসাজে সজ্জিত হইয়া তুরঙ্গপৃষ্ঠে

বসিয়াছেন—সুতরাং কেহ তাঁহাকে একবার দেখিয়া দীদৃক্ষা কৌতুক নিবারণ করিতে পারিল না।

খাঁ সাহেব সকলের অগ্রে, তাঁহার পার্শ্বে কাসিম—পশ্চাতে শিবিকারূঢ়া আমিনা, সকলের পশ্চাতে অনুচরবর্গ গ্রাম ছাড়িয়া, প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন।

সেকালে পথে দস্যুভয় বড় কম ছিল না—তাহার উপর মহারাষ্ট্র-দিগের উপদ্রবও যথেষ্ট ছিল। কাসিম আলি খাঁ সাহেবের সহিত সেইসকল বিষয়ের আলোচনা করিতে-করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমিনা শিবিকায় বসিয়া, দ্বার ঈষৎ উন্মোচনপূর্ব্বক পথের উভয়পার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে-দেখিতে চলিলেন।

বৈশাখের মধ্যাহ্নে পথ চলা বড় সুখপ্রদ নয়। বিশেষতঃ সঙ্গে স্ত্রীলোক রহিয়াছেন। তাঁহারা একটী পল্লীপ্রান্তরে উপস্থিত হইয়া পটাবাস রচনা করিয়া, বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অপরাহ্নে সূর্য্যকর মন্দীভূত হইয়া আসিলে পুনরায় সকলে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা একটী বনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই কান্তার উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহারা আমেদাবাদের সীমায় উপনীত হইতে পারেন। বনের পার্শ্ব দিয়া পথ—সকলে দ্রুত চলিতে লাগিলেন।

দিবসের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড করজাল সংহত করিয়া পশ্চিম গগন-পারাবারে বিলীন হইবার উপক্রম করিতেছেন। দিগ্‌দেশাগত বিহঙ্গমকুল কান্তারকুঞ্জে আশ্রয় লইয়া কলরব করিতেছে। বন-কুসুমের সুরভি-সম্ভার অঙ্গে মাখিয়া বনানিল সন্ধ্যাসতীর সম্বর্দ্ধনার জন্য ধীর-মন্থরগতিতে বহির্গত হইতেছে। সকলে অদূরপ্রান্তরে বনান্ত-শায়িনী পল্লীর সুশান্তকোলে রাত্রিযাপন-মানসে অগ্রসর হইতেছেন,

এমন সময়ে সহসা বন-ভূভাগ প্রকম্পিত করিয়া, বর্শা ও তরবারি করে পনের-ষোলজন মহারাষ্ট্রদস্যু ক্ষুধিতব্যাঘ্রের মত তাঁহাদের ঐ-ক্ষুদ্রদলের উপর আপতিত হইল ;

রহমন খাঁ পিস্তল লইয়া, পুরোবর্ত্তী ব্যক্তির ললাটে আঘাত করিলেন। লোকটা সেইস্থলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইল। পিস্তলে দ্বিতীয়বার গুলি ভরিবার অবকাশ ছিল না। সুতরাং পিস্তল ফেলিয়া তরবারি লইয়া আক্রমণ করিলেন। চারিজন শিবিকা রক্ষায় নিযুক্ত হইল। কাসিম অবশিষ্ট বারজনকে লইয়া শৃঙ্খলমুক্ত কেশরীর মত দস্যুদলের উপর পড়িলেন। তাঁহার দীর্ঘতরবারির আঘাতে দুইজনের প্রাণহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। তৃতীয় ব্যক্তির বর্শাসহ দক্ষিণহস্ত ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। খাঁ সাহেবেরও একজন অনুচর বর্শাবিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল—আরও একজন বিষম আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দস্যুরা শিবিকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে খাঁ সাহেব কুপিত হইয়া, সেইদিকে প্রধাবিত হইলেন। পশ্চাৎ হইতে একজন দস্যু তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটা বর্শা ছুড়িয়া মারিল। আমিনা শিবিকার মধ্য হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু বর্শাফলক খাঁ সাহেবের মস্তকে বিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই, কাসিমের অসিচালন কৌশলে, তাহার সংঘর্ষে উপস্থিত হইয়া দশহাত অন্তরে গিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে সেই বর্শাক্ষেপণকারীর মস্তকও স্কন্ধচ্যুত হইয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিল। দস্যুগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসাতে তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

দস্যুগণ প্রস্থান করিলে খাঁ সাহেব শশব্যস্তে শিবিকার নিকট উপস্থিত হইয়া আমিনার সংবাদ লইবেন। তাঁহার কোনই অনিষ্ট

হয় নাই কিন্তু তিনি শিবিকার মধ্যে বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছেন। খাঁ সাহেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া, কাসিমের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন,—"আজও তোমারই শৌর্য্যে ধন-প্রাণ রক্ষিত হইল। আমি তোমার অস্ত্র-সঞ্চালন কৌশল সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি কিন্তু এ কি! তুমি আহত হইয়াছ।"

কাসিম কহিলেন,—"ও কিছুই নয়, সামান্য আঘাত।"

খাঁ সাহেব। সামান্য আঘাত কি! রক্তে যে সমস্ত অঙ্গ ভাসিয়া গেল।

কাসিম। মণিবন্ধে একটা চোট লাগিয়াছে মাত্র।

খাঁ সাহেব। দেখি, তত গুরুতর নয় ত? না—যাহাই হউক, রক্তস্রাব বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

সঙ্গে এক ক্ষৌরকার ছিল, সে উত্তমরূপে হাতে জলপটী বাঁধিয়া দিল। আবার সকলে যাত্রা করিলেন। এবং সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বে লোকালয়ে উপস্থিত হইলেন। এ গ্রামে কাসিমের এক পিতৃবন্ধুর বাস—তিনি সকলকে সমাদরে স্ব-গৃহে আশ্রয় দিলেন।

পথশ্রমে এবং রক্তস্রাবে কাসিম ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্রামার্থ শয্যা রচিত হইলে, তিনি তথায় শয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। খাঁ সাহেব কাসিমের পিতৃ-বন্ধুর সহিত বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। পুরোকামিনীরাও তাঁহাদের পরিচর্য্যার্থ আহার্য্যাদি প্রস্তুত করণে ব্যস্ত হইলেন।

আমিনা কাসিমের পার্শ্বস্থ কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, সকলে

তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে, তিনিও উঠিয়া বসিলেন এবং ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া কাসিমের শয়নকক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কক্ষে আলোক জ্বলিতে-ছিল—দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত। আমিনা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কাসিম আলিকে দেখিতে লাগিলেন। বিদেশে এই অপরিচিত যুবকের মহাপ্রাণতায় দুইবার তিনি আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইলেন। কি তাঁহার অস্ত্রচালন-শিক্ষা! কি সুন্দর তাঁহার শত্রুর আঘাত নিবারণ করিবার ক্ষমতা! আমিনা অনেকক্ষণ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অনিমেষ-নয়নে গুণ-মুগ্ধপ্রাণে কাসিমের সুপ্ত, সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল। আমিনার মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তিনি সেস্থানে আর দাঁড়াইলেন না। স্ব-গৃহে প্রবেশ করিয়া বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর শয়ন করিলেন। সে রাত্রিতে আমিনার সুনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিল। কেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ

সুখ কোথায়

পরদিন প্রত্যূষে আবার সকলে যাত্রা করিলেন। এবং মধ্যাহ্নে পালানপুরে উপস্থিত হইলেন। পালানপুর সুরক্ষিত নগর, এখানে একটী সামান্য দুর্গও আছে। আমিনা এবং অপরাপর অনুচর-বর্গকে পশ্চাতে আসিতে আদেশ করিয়া, আবদুল রহমন কাসিম আলির সহিত নন্দীপুর দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পালানপুর হইতে নন্দীপুর বেশী দূর নয়—সেস্থানে তাঁহার অধীন একদল

সেনা অবস্থান করিতেছিল,—আমেদাবাদে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদিগকে একবার দেখিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন।

তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, দূর হইতে নন্দীপুর গিরি-দুর্গের উন্নত-শীর্ষ তাঁহাদের নয়নপথবর্ত্তী হইল। খাঁ সাহেব কাসিম আলিকে কহিলেন,—"ঐ দেখ দুর্গ দেখা যাইতেছে! অতি ভয়ঙ্কর স্থান। উহার মধ্যে যে কারাগার আছে, সে স্থান হইতে কদাচিৎ কাহাকে জীবিত বাহির হইতে দেখা যায়।"

কাসিম আলি শিহরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি উহার মধ্যে বধ্যভূমি আছে?"

হাসিয়া খাঁ সাহেব কহিলেন,—"আছে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত সত্য ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান অতি অল্পই এ দুর্গে প্রেরিত হইয়াছে। কাফের হিন্দু এবং বিদেশী ফিরিঙ্গিদের জন্যই উহার অস্তিত্ব। যে সকল হতভাগ্য দুর্ভাগ্যক্রমে নবাবের কোপ-নয়নে পতিত হয়, তাহাদিগকে প্রথমতঃ ঐ দুর্গে আবদ্ধ রাখা হয়। পরে ঐ-পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চস্থান হইতে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করা হয়। হতভাগ্যেরা কেহ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই ভয়ে প্রাণ হারায়—কেহবা পতিত হইয়া উচ্ছিন্নশির, বিকৃতবদনে রক্তবমন করিতে-করিতে জীবন বিসর্জ্জন করে—কেহবা নিক্ষিপ্ত হইয়াও বহুক্ষণ জীবিত থাকে, শেষে হিংস্রজন্তুর তীব্রদংশনে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করে। ঐ দেখ আকাশে শকুনী, গৃধিনী কত উড়িতেছে। বোধ হয় সম্প্রতি কোন হতভাগ্যের জীবন-লীলা শেষ হইয়াছে।"

কাসিম আলি ব্যথিত-অন্তরে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মানুষে এত নির্দ্দয় হইতে পারে, তাঁহার ধারণাও ছিল না।

সে যাহা হউক তাঁহারা অপরাহ্ণ অতীত হইবার পূর্ব্বে নন্দীপুরে উপস্থিত হইলেন। জমাদার জাফর সাহেব তথায় সদলবলে অবস্থান করিতেছিলেন। খাঁ সাহেবের অনুপস্থিতিতে তিনিই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন। উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আগমনে জাফর সাহেব দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া লইয়া আসিলেন। তিনি কাসিম আলির দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টি কাসিমের ভাল লাগিল না,—তিনি বুঝিলেন যে কোন কারণেই হউক এ ব্যক্তি তাঁহার শত্রুতাচরণ করিবে।

খাঁ সাহেব বিশ্রাম করিতে-করিতে জাফর সাহেবের সহিত বিবিধ-বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয় অবগত হইলেন। ছয়মাসের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইংরাজদের সহিত নবাবের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। লালুয়ের পর্ব্বতদুর্গ তাঁহারা অধিকার করিয়া লইয়াছেন—বেতনোরের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—বেতনোর তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল কিন্তু পুনরায় তাঁহারা উহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত বড় রকমের একটা যুদ্ধ বাধিবে। মাদ্রাজ ও বাঙ্গালা দেশ হইতে ইংরাজের নূতন সৈন্য আসিতেছে। ত্রিবাঙ্কুরেও একটা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে,—এই সকল কারণে নবাব বাহাদুর তাঁহাকে সত্বর রাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কিঞ্চিৎ জলযোগের পর রহমন খাঁ কাসিম আলিকে সঙ্গে লইয়া দুর্গের বিভিন্নস্থান প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এ দৃশ্যটা নীচপ্রকৃতি জাফর সাহেবের চক্ষে তত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল

না। তিনি তাঁহার প্রিয় অনুচর মাদার খাঁকে আহ্বান করিয়া, বিষোদ্গার করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন,—"মাদার সর্ব্বনাশ হইল! এইবার আমাদের বাড়াভাতে ছাই পড়িবে। ছোঁড়টাকে যেরূপ চালাক-চতুর বোধ হইতেছে, শীঘ্রই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে। কি আক্ষেপ—একটা অজাতশ্মশ্রু বালকে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে! কখনই না! মাদার! অনুসন্ধান লও ত ছোঁড়াকে।"

প্রভুর গুণ প্রায়ই ভৃত্যে বর্ত্তিয়া থাকে। বিশেষতঃ এরূপ বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং প্রভু যে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইবে। তাহা বলাই বাহুল্য। মাদার সাহেব কহিল,—"জমাদার সাহেব, আমার বোধ হইতেছে, খাঁ সাহেব বুড়বয়সে এই যে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন ঐ ছোঁড়াটা তাহারই ভাই। বৃদ্ধবয়সের সুন্দরী-ভার্য্যার সহোদর —নচেৎ এত খাতির হয়!"

জমাদার সাহেব শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক-ঠিক! তোমারই অনুমান ঠিক! বোধ হয় কোনও একটা বড় চাকরী করিয়া দিবে।"

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি সঠিক সংবাদ লইয়া আসিতেছি।" —বলিয়া মাদার খাঁ প্রস্থান করিল।

এদিকে খাঁ সাহেব ও কাসিম আলি বিভিন্নস্থান সন্দর্শন করিয়া, দুর্গ-তোরণে উপস্থিত হইলেন। এইসময়ে রক্ষি-পরিবৃত আমিনার শিবিকা আসিয়া পৌছিল। যে পট্টাবাসে তিনি রাত্রিবাস করিবেন, পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। খাঁ সাহেব কাসিমকে সেই পট্টাবাস দেখাইয়া দিতে বলিয়া, অন্য কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। কাসিম শিবিকার সহিত তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কাসিমের

কণ্ঠস্বর শুনিয়া, আমিনা শিবিকাদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক আর সৌভাগ্যক্রমেই হউক চারিচক্ষের মিল হইল। কাসিম বুঝিলেন সে দৃষ্টি নিতান্ত অপ্রীতিকর নয় বরং আশাপ্রদ।

আমিনাও তাঁহার সাভিনিবেশ কটাক্ষপাতে বুঝিতে পারিলেন,—কাসিম আলি—তাঁহার জীবনরক্ষক, তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। এই জ্ঞানের উপলব্ধি হইবামাত্র, তাঁহার হৃদয়ে যেন কি এক নব-ভাবের সঞ্চার হইল। চন্দ্রাকর্ষণে বারিধি-বক্ষের ন্যায় তাঁহার হৃদয়-সমুদ্রও যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের বেগ দমন করিতে না পারিয়া, আমিনা চঞ্চল নয়নে আবার চাহিলেন—আবার চারিচক্ষে মিলন হইল। উভয়েই আত্মহারা হইলেন।

শিবিকা যথাস্থানে উপস্থিত হইল। কাসিম আলি সত্বর সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন। আমিনা পট্টাবাস মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মাদার খাঁ নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল না। পরিশেষে কাসিমকে পাল্কীর সহিত পট্টাবাসাভি-মুখে যাইতে দেখিয়া, কাসিম যে খাঁ সাহেবের নবপরিণীতা পত্নীর সহোদর, সে সম্বন্ধে তাহার আর কোনই সংশয় রহিল না। সেই সঠিক সংবাদটি প্রভুর গোচর করিতে আসিতেছিল, এমন সময়ে খাঁ সাহেবের সহিসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্ব হইতে উভয়ের মধ্যে একটু আলাপও ছিল। একথা-সেকথার পর, মাদার খাঁ কাসিমের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সহিসের মুখে সকল কথা শুনিয়া, মাদার কহিল,—"তাহা হইলে ছোঁড়াটা খাঁ সাহেবের সম্বন্ধী নয়? যেরূপ ভাবে পাল্কীর সঙ্গে যাইতেছে, আমি মনে করিলাম খাঁ-পত্নীর সহোদর।

সহিস হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। শিবিকাকে পট্টাবাসের দ্বারে রাখিয়া কাসিম আলি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, মাদার খাঁর রসিকতা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে তাহাকে জাফর সাহেবের কক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কাসিম আলির বিষয় কি অনুসন্ধান করিতেছিলে?"

তাঁহার বজ্রমুষ্টি হইতে নিজ-হস্ত মুক্ত করিতে না পারিয়া মাদার খাঁ ভীত হইয়া কহিল,"—আমার প্রভু আপনি কে, কোথায় নিবাস এবং কি প্রকারে হাতে আঘাত পাইয়াছেন জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, অন্য কোন কু-অভিপ্রায় নাই।"

"কু-অভিপ্রায় নাই!" চীৎকার করিয়া কাসিম কহিলেন,—"শয়তান তোর আবার কু-অভিপ্রায় নাই! তোর চোখে, মুখে, ললাটে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে—পরহিংসা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা তোর ব্যবসা। পুনরায় যদি তোকে আমার বিষয় লইয়া বিদ্রূপ করিতে শুনিতে পাই, আমি তোর হাড় ক'খানা চূর্ণ করিয়া দিব।"

গোলযোগ শুনিয়া তথায় অনেক লোক জমিয়া গেল। মাদার খাঁর স্বভাব সকলেই জানিত। সে সকলের নিকট তিরস্কৃত এবং লাঞ্ছিত হইয়া দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

জমাদার সাহেব তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভৃত্য উপস্থিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে-মুছিতে কহিল,—"যথেষ্ট হইয়াছে—এমন অপমান জীবনে কখনও হয় নাই! কি অপমান! কি লাঞ্ছনা! ইহার কি প্রতিকার হইবে না? ইহার কি প্রতিহিংসা নাই?"

শশব্যস্তে জাফর সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাদার কহিল,—"ছোঁড়ার কি তেজ! এত স্পর্দ্ধা কখনও ভাবি নাই। আমার

অপমানের একশেষ করিয়াছে! করুক—সহ্য হয় কিন্তু আমার সাক্ষাতে আমার প্রভুর অপমান? একেবারে অসহ্য!"

জমাদার সাহেব বসিয়াছিলেন। উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মাদার! আমার অপমান? কি বলিয়াছে?"

মাদার কহিল,—"সে অনেক কথা—সব আমার মনে নাই। আপনাকে কাপুরুষ, অভদ্র, শয়তান আরও কত কি বলিয়াছে। আপনার দাড়ি ছিঁড়িবে—সামান্য কুকুরের মত লাথি মারিবে।"

সজোরে উরুপ্রদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া আরক্তনেত্রে জাফর সাহেব কহিলেন,—"কি আমাকে এমন কথা! আমার এত অপমান! যাহার নাম শুনিলে কত লোকের বুকের রক্ত শুখাইয়া যায়—যে বিক্রমে কেশরী—প্রতাপে শমন তাহার এত অপমান! বিসমোল্লা! জাফর সাহেব জমাদার ক্ষমা করিবার লোক নয়! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!"

ভৃত্যপ্রবর কল্পনা সাহায্যে নানারঙ্গে নানাঢঙ্গে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া সেই বিষয়টী পুনঃ-পুনঃ প্রভুকে শুনাইতে লাগিল। উপযুক্ত প্রভুও কোরাণের বয়েদের মত সে-গুলিকে সত্য মনে করিয়া কাসিম আলির উচ্ছেদের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

ঐ-দিন নন্দীপুর গিরিদুর্গের পট্টাবাস মধ্যে আর একটী ঘটনা ঘটে, তাহার বিষয় পাঠককে জ্ঞাত না করিয়া, এই-স্থলে এ-পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি করিতে পারিতেছি না।

দিব্য জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। আকাশে তারকা-মালা, তরুশীর্ষে, তাহার শ্যামপত্রপুঞ্জের উপর খদ্যোতের খেলা, ধীর-সমীরের মৃদুলহিল্লোলে সুরভি কুসুমকুলের বিকাশ, প্রকৃতির মুখভরা হাস—যে দিকে দেখা যায়, সেইদিকেই আনন্দ-স্রোত, সেইদিকেই সুখের প্রবাহ।

এই সুখদায়িনী জ্যোৎস্না-স্নাত যামিনীতে পট্টাবাস মধ্যে দুইটী হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া, নদীতরঙ্গের উত্থান-পতনের ন্যায় তালে-তালে নাচিতেছে। প্রণয়-সম্ভাষণে আত্মহারা হইয়া এ-উহার মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে—কত সুখের স্বপন —আনন্দের নৃত্য দেখিতেছে। পঞ্চাশৎবর্ষীয় আবদুল রহমন ষোড়শী ভার্য্যার মুখের পানে অতৃপ্ত-নয়নে চাহিয়া আছেন, আর অনঙ্গ-মোহিনী আমিনা নবপল্লব-সুন্দর ক্ষুদ্র-কর-পল্লবে তাঁহার হস্তে হস্তাবর্ত্তন করিতেছেন। কে বলিবে এ-দুইটী প্রাণী অসুখী? কে বলিবে এ-দম্পতীর সুখ-সম্ভোগের উপর কালের কুটীল-প্রবাহ অলক্ষ্যে আসিয়া পড়িয়াছে?

হায় রে জগৎ! তোমাতে কি পবিত্র নিরাবিল সুখ নাই? সংসারের সন্তাপবিহীন, সুধামাখা সারল্যপূর্ণ সুখ কি তোমাতে পাওয়া যায় না? যায়—কৈ?

আমিনা—সরলতার মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা, কাসিমের মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া, ছলনার ছায়ায় হৃদয়ভাব গোপন করিয়া পতির সন্তোষ জন্মাইতে হাসিতেছে; আর আবদুল রহমন সেই ছলনামাখা ললনার অধরহাসিতে মোহিত হইতেছেন এবং নিজেও হাসিয়া হৃদয়ের কোন একটী গুরুভারকে চাপা দিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাই বলিতেছিলাম জগতে কি প্রকৃত সুখ নাই? যদি এমন দাম্পত্য প্রণয়ে সুখ না থাকিল, তবে সুখ আর কোথায়? যেখানে কুটিলতার বিকাশ, যেখানে জায়া, পতি নিজ-নিজ মনোভাব ছলনার আবরণ দিয়া ঢাকিতে প্রয়াস পায়, যেখানে মনের আগুনে হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইলেও, পরকে ভুলাইতে হাসির তরঙ্গ তুলিতে হয়, সেখানে কি সুখের কণামাত্র অবস্থান করিতে পারে?

আমিনা মনে ভাবিতেছে—কাসিমের সুন্দরমূর্ত্তি, অপ্রমেয় গুণ-রাশি, আর মুখে বলিতেছে,—"খাঁ সাহেব! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।" ইহারই নাম পতিভক্তি—ইহারই নাম দাম্পত্য-সুখ—আর এই সুখের জন্যই জগত লালায়িত!

জগতে সকলেই রূপের সেবক—সৌন্দর্য্যের দাসানুদাস—গুণের পক্ষপাতী। আমিনা কাসিম আলির সুন্দর মুখ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন, সর্ব্বোপরি কৃতজ্ঞতার গুরুভারে অবনমিতমস্তকে তাঁহার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। বিগত-যৌবন পতির সহিত প্রেমালাপ করিতে-করিতে যখন যুবক কাসিম আলির অকলঙ্ক শশাঙ্ক-সদৃশ মুখকান্তি মনে পড়িতেছে, তখন স্বতই তাঁহার মনে হইতেছে,—"হায় যদি এই বৃদ্ধের পত্নী না হইয়া, ঐ যুবক কাসিমের ভার্য্যা হইতাম, তাহা হইলে জীবন কত সুখের হইত! মরি-মরি কি সুন্দর মূর্ত্তি!" অমনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল—হৃদয় দুলিয়া উঠিল—তাঁহার চাঞ্চল্য আসিয়া চোখে মুখে প্রকাশ পাইল। মুগ্ধপতি ভাবিলেন—প্রেমের অভিব্যক্তি!

আর এদিকে আবদুল রহমন ভাবিতেছেন,—"কেমন করিয়া বলিব, কেমন করিয়া তাহার কুসুম কোমল প্রাণে ব্যথা দিব? কিন্তু যতক্ষণ একথা তাহাকে না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার কিছুতেই সুখ নাই! আর কত দিনই বা চাপা দিয়া রাখিব—আজ না হয় কাল শুনিবেই ত।" খাঁ সাহেবের মনের ভাব এই প্রকার। উভয়েই মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে হাসিতেছেন, কথা কহিতে-ছেন, হৃদয়ে কিন্তু চিন্তার অবিশ্রান্ত স্রোত ফল্গু নদীর প্রবাহবৎ অবাধে চলিতেছে। অথচ তাঁহারা সুখী। লোকে তাঁহাদের সুখ-

সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা করে, ঈর্ষার বিষজ্বালায় দগ্ধ হইয়া মরে,—ইহারই নাম জগৎ—ইহারই নাম জগতের সুখ।

অনেক কথাবার্ত্তার পর রহমন খাঁ কহিলেন,—"আমিনা! হৃদয়েশ্বরি! তোমার নিকট আমি আমার দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কতকগুলি কথা তোমাকে এতদিন বলি নাই—আমি আর গোপন রাখিতে পারিতেছি না, সকল কথা আজ তোমায় বলিব।"

আমিনা খাঁ সাহেবের ভূমিকা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। খাঁ সাহেব পুনরায় কহিলেন,—"দেখ আমিনা! আমার আর দুইটী স্ত্রী বর্ত্তমান আছে। আমি সুখী হইবার জন্য দুই বার বিবাহ করিয়াছিলাম কিন্তু কেহই আমাকে সুখী করিতে পারে নাই। একে দুইজনেই কলহপ্রিয়া, আত্মসুখরতা, তাহার উপর কাহারও সন্তানাদি হয় নাই। পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির উপর উভয়েরই আন্তরিক টান অধিক,—আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। সেইজন্য তোমায় বিবাহ করিয়াছি। তুমি আমাকে সুখী করিবে বলিয়া তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তুমি কি আমায় সুখী করিবে না আমিনা? তোমা হইতে শেষ জীবনে আমি কি একটু সুখের অনুভূতি দেখিতে পাইব না? ও কি আমিনা! তুমি কাঁদিতেছ? কেন? সপত্নীভয়ে? তাহাদের সাধ্য কি যে তোমাকে কোন কথা বলে! তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তোমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবার তাহাদের সামর্থ্য কোথায়! চুপ কর আমিনা!"

আমিনা বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন,—

"হায়! একথা যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিতাম! এ দূরদেশে কে আমাকে তাহাদের দুর্ব্ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবে? আমি বালিকা, তাহাদের ছলনা চাতুরী ভেদ করিতে না পারিয়া পদে-পদে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিব!"

খাঁ সাহেব অনেক বুঝাইলেন, কত সান্ত্বনা করিলেন, আমিনার প্রাণ কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। কাঁদিয়া-কাঁদিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

খাঁ সাহেব জাগ্রতই ছিলেন। আমিনাকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনিও পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। আজ তাঁহার হৃদয় হইতে একটা গুরুভারের অপনোদন হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সপত্নী সম্ভাষণে

পর দিবস রহমন খাঁ সদলবলে বেতনোর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিন-চারি দিবস বিশ্রাম করিয়া সকলে আমেদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেতনোর দুর্গে অনেক ইংরাজ কয়েদী বন্দী ছিল এবং রাজকোষে বিস্তর টাকা মজুত ছিল; নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা একখানা পত্র লিখিয়া সে সকল রহমন খাঁর সঙ্গে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। বন্দী এবং অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একদল সৈন্যও গমন করিল।

কাসিম আলি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ইংরাজদিগকে দেখেন নাই। লোকপরম্পরায় তাহাদের সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি

গুণের এবং কুৎসিত আচার-ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বহুল দোষের কতপ্রকার রঞ্জিত গল্প শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রক্ষিপরিবৃত বন্দীগণ দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল,—তিনি অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গদ্বারে অবস্থিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে শ্বেতকায় মানবগণকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের বিশুষ্ক, মলিন, অনাহারে ক্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। কাহারও-কাহারও আবার হস্ত ও পদদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। বন্দীগণের মধ্যে একজনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার উন্নত প্রশান্ত ললাট, গম্ভীর শান্ত মুখকান্তি, এত অনাহার, অত্যাচারের মধ্যেও নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া, স্বতই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এব্যক্তি কখনও সামান্য সৈনিক নয়—নিশ্চয় কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

বন্দীরা যখন একে-একে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, তখন তাহাদিগকে দেখিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। অনেকেই তাহাদিগকে বিদ্রূপ বা অশিষ্টভাষায় গালি দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না। একটি দুরন্ত বালক একখণ্ড ইষ্টক তুলিয়া লইয়া কৌতুক করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সৈনিকপুরুষের প্রতি সবলে নিক্ষেপ করিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল। বালকের উৎসাহ বাড়িল। দ্বিতীয়বার যেমন আর একটী ইষ্টকখণ্ড তুলিতে চেষ্টা করিবে, অমনি কাসিম আলি নক্ষত্রবেগে তাহার নিকট অশ্ব চালিত করিয়া, তাহার পৃষ্ঠে দুই চাবুক বসাইয়া দিলেন। বালক আর্ত্তনাদ করিতে-করিতে ছুটিয়া পলায়ন করিল। কাসিম আহতব্যক্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার আঘাত তত গুরুতর হইয়াছে কি না দয়ার্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরাজ উত্তর করিলেন,—"না বেশী লাগে নাই! আমার মত ভাগ্যপীড়িত অসহায়ের প্রতি যাঁহার সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়, নিশ্চয় তাঁহার হৃদয় অতি উদার। যুবক! যদি কখনও অবসর পাই, আপনার এই করুণ-ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হইব না। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

বন্দী চলিয়া গেল। কাসিমও রহমন খাঁর আহ্বানে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। পথে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। পঞ্চম দিবসে আমেদাবাদের সৌধশ্রেণী তাঁহাদের নয়ন-পথবর্ত্তী হইল।

ক্রমশঃ তাঁহারা নগরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমেদাবাদ সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নগর। তাহার মধ্যে দুর্গ, রাজ-প্রাসাদ, গির্জ্জা, মন্দির, হাটবাজার সমস্তই আছে। কাসিম আলি রাজধানীর শোভা দেখিয়া প্রীত হইলেন।

খাঁ সাহেব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, পট্টাবাসমধ্যে আমিনাকে রাখিয়া, ত্বরিতপদে দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন। দুর্গে তাঁহার সপরিবারে অবস্থান করিবার জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে। খাঁ সাহেব নিজভবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার পারিবারিক দুই-একটি ঘটনার বিষয় অগ্রে বলা শ্রেয় বিবেচনা করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আবদুল রহমন খাঁর পূর্ব্ব দুই স্ত্রী বর্ত্তমান। একের নাম চাঁদমণি, অপরার নাম ফুলকুমারী। প্রথমা প্রৌঢ়া—যৌবনরাজ্যের প্রান্ত সীমায় অবস্থিতা। দ্বিতীয়া নবীনা নিতম্বিনী যুবতী। চাঁদমণি বিকসিতা, সুরভিকা, প্রভাত-শেফালিকা; আর ফুলকুমারী ফুলকুলরাজেশ্বরী মধ্যাহ্ন-নলিনী। দুইজনকেই দেখিতে

সুশ্রী। দুইজনেই সুকেশিনী, সুহাসিনী, সুন্দরী। রূপে দুইজনেই অতুল্যা, তবে বয়সের ইতর বিশেষ বশতঃ যাহা কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ার যৌবন-নদী খরস্রোতবতী—তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে নাচিতেছে, দুলিতেছে, হেলিতেছে, সৌরকরে হাসিতেছে, চাকচিক্যে জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। প্রথমার স্রোত আছে—বেশ একটানা স্রোত কিন্তু তাহাতে তরঙ্গ খেলে না, ঘাত-প্রতিঘাতে জল ভাঙ্গে না। জলরাশির উপর যেন কিসের একটু আবছায়া পড়িয়াছে, তাহাতে যেন তাহার গভীরতা আরও অনুমেয় বোধ হইতেছে। সেই সুধীরা, সুগভীরা স্রোতস্বতী ঈষন্মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার চারুরশ্মিজাল বক্ষে ধরিয়া হাসিতে-হাসিতে বহিতেছে।

দুই স্ত্রীর এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, তবে খাঁ সাহেব আবার বিবাহ করিলেন কেন? সুরসিকা পাঠিকা হয়ত ভাবিবেন বৃদ্ধ বয়সের বাতিক বলিয়া।

খাঁ সাহেবের দুই স্ত্রী সত্য কিন্তু তিনি একটীতেও সুখী হইতে পারেন নাই। চাঁদমণিকে প্রথমে বিবাহ করিয়া প্রথম-প্রথম বেশ সুখে কালাতিবাহিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি না হওয়ায়, পুনরায় ফুলকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এবারও সেই ফল ফলিল। পুত্রত হইল না বরং কতকগুলি অশান্তি বাড়িল। ফুলকুমারী যেমন মুখরা, তেমনই গর্ব্বিতা। সপত্নীকলহে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ব্যস্ত হইবার আরও একটা কারণ আছে। উভয় স্ত্রীর পিত্রালয়ই নিকটে। তাঁহাদের মাতা, পিতা, ভাই-ভগ্নীরা পর্য্যন্ত সেই কলহে পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। এইসমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া, মনের প্রণষ্ট শান্তির পুনরুদ্ধারমানসে দূরদেশে এক বিবাহ করিতে তাঁহার বহুদিন

হইতে সাধ হইয়াছিল। প্রথম দুইস্ত্রীই আমেদাবাদবাসিনী, এবার তাঁহার জন্মভূমি হায়দারাবাদে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, আমিনার রূপমাধুরীদর্শনে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া, কর্ম্মস্থল আমেদাবাদে লইয়া আসেন।

খাঁ সাহেব যে তৃতীয়বার বিবাহ করিতেছেন, এ সংবাদ চাঁদমণি বা ফুলকুমারী কেহই জানিত না। নববিবাহিত দম্পতী নন্দীপুর দুর্গে উপনীত হইলে, ফুলকুমারীর এক সহোদর সে সংবাদ অবগত হইয়া, পত্রদ্বারা ভগ্নীকে সকল বিষয় জ্ঞাপন করেন। ফুলকুমারী এই সংবাদে পদবিদলিতা কালভুজঙ্গিনীবৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। চাঁদমণির সহিত অন্যসময়ে বাক্যালাপ না থাকিলেও, এক্ষণে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সকল কথা কহিলেন। দুইজনে মিলিয়া খাঁ সাহেব এবং তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে যথাসত্বর জাহান্নমে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

স্ববাসে প্রবেশ করিতে রহমন খাঁর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এখনই সকল কথা শুনিয়া দুইরমণী বাঘিনী এবং সাপিনীর মত তাঁহাকে দংশন করিবে। নারীর দাঁতে বিষ আছে—সে বিষের জ্বালাকে ভয় করেন না, এমন পুরুষ অতি বিরল।

তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন বিস্তৃতপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে কামিনীকুঞ্জের নিম্নদেশে শীলাতলে দুইসতীনে পাশাপাশি বসিয়া, হাসিয়া-হাসিয়া গল্প করিতেছে। এ-দৃশ্য তাঁহার চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। এ যে বাঘিনী হরিণীর প্রেমে আবদ্ধা! তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল না বা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও

চাহিল না! খাঁ সাহেব—নবাবের সেনাপতি, দুইটী রমণীর সম্মুখে বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল, আপনাকে অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আর অপেক্ষা করিয়া অধিক লাঞ্ছিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কুপিতস্বরে কহিলেন,—"ব্যাপার কি? চাঁদমণি! ফুলকুমারী তোমাদের উদ্দেশ্য কি? আমি আসিয়াছি, তোমরা কি দেখিতে পাও নাই? আমি কি এতই অবজ্ঞার পাত্র? ধিক আমাকে! ধিক তোমাদের মত স্ত্রীকে! স্বামীর প্রতি তোমাদের কি কিছুমাত্র ভক্তি নাই? আমাকে কি তোমাদের মানুষ বলিয়া বোধ হয় না?"

লজ্জিত হওয়াত দূরের কথা, তাঁহার কথায় একটা উত্তর দেওয়াও কেহ কর্ত্তব্য বোধ করিল না। পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর ফুলকুমারী চাঁদমণিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার মৃণালদণ্ডবৎ ভুজদণ্ড চম্পকাঙ্গুলিদ্বারা ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া কহিল,—"মানুষের চামড়া গায়ে থাকিলেই বুঝি মানুষ হয়? যে একটা বেশ্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিতে পারে, তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়?"

খাঁ সাহেব অন্ধকারে ঘুরিতেছিলেন, এইবার আলোক পাইলেন। উভয়ের মধ্যে কি কারণে সম্প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। ফুলকুমারীর ব্যঙ্গোক্তিতে ব্যথিত এবং যার-পর-নাই কুপিত হইয়া রহমন খাঁ, উভয়কে বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন,—"তোমরা প্রস্তুত থাকিবে; আমি সন্ধ্যার সময় আমিনাকে বাড়ীতে লইয়া আসিব, যদি তাহার আদর-অভ্যর্থনায় কোনরূপ ত্রুটী হয়, তোমাদের পরিণাম বড় সুখের হইবে না। আমি উভয়কেই বাড়ী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিব।"

চাঁদমণি চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে কহিল,—"আর কোন ক্ষমতা আছে? হায়-হায় এমন হতভাগ্যের হাতে পড়িয়াছিলাম, একদিনও সুখী হইতে পারিলাম না।"

"ওসব পুরাণ কথা এখন রাখ, যাহা বলিলাম, তাহার অন্যথা হইলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পারিতেছ।"—এই বলিয়া খাঁ সাহেব বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর ফুলকুমারী ও চাঁদমণি রাগে, অভিমানে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিল। খাঁ সাহেব এবং তাঁহার প্রিয়তমা নবপত্নীর উদ্দেশে কত গালিবর্ষণ করিল। তাহার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া উভয়ের সর্ব্বনাশের কত শলা-পরামর্শ আঁটিল। কিন্তু কোনটীই মনঃপূত না হওয়ায় অবশেষে ফুলকুমারী তাহার মাতাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। অনতিবিলম্বে একখানি শিবিকা আসিয়া রহমন খাঁর অন্তঃপুরদ্বারে লাগিল। এক স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়সী অতি কষ্টে শিবিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া সকল কথা শুনিল। ফুলকুমারী মাতার পায়ে ধরিয়া অনেক কাঁদিল। চাদমণিও অনুনয়-বিনয়সহকারে ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে কহিল। বৃদ্ধা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কহিল,—"তোমরা বাছা! এক কাজ কর। বিবাদ-বিসম্বাদ করিও না, তাহাতে কোনই ফল ফলিবে না। মুখে আদর-সম্মান করিতে ক্রটী করিও না। আমি সেই হতভাগীর সর্ব্বনাশ করিব। ফুলকুমারী! তুই জানিস তোর বাবা একবার একটা বেশ্যাকে লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিল। আমাদের ও পাড়ার কাজের-মা ভারি ওস্তাদ। আমি তাহাকে সকল কথা বলি, সে আমাকে সে যাত্রা রক্ষা করিয়াছিল। আজই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

ফুলকুমারী এবং চাঁদমণি উভয়েই সমস্বরে বলিল,—"তাই কর মা! তাই কর! আমাদিগকে বাঁচাও। হতভাগা খাঁ সাহেব যদি সেই সর্ব্বনাশীতে অনুরক্ত হয়, আমাদের আর দুর্দ্দশার বাকি থাকিবে না।"

প্রতিশ্রুত হইয়া বৃদ্ধা প্রস্থান করিল। ফুলকুমারী এবং চাঁদমণি নববধূর অভ্যর্থনার জন্য কি-কি করা কর্ত্তব্য, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে-দেখিতে বেলা গেল, ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া ধরাতল আচ্ছাদিত করিল। লতায়-লতায় ফুল ফুটিল, আকাশে চাঁদ উঠিল। ঠিক এমনই সময়ে একখানি শিবিকা আসিয়া আবদুল রহমন খাঁর পুরদ্বারে লাগিল। ফুলকুমারী এবং চাঁদমণি শশব্যস্তে শিবিকার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, সমাদার করিয়া, আমিনাকে তুলিয়া লইয়া আসিল। খাঁ সাহেব পশ্চাতেই ছিলেন, রমণীদ্বয়ের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, তাহাদের ভাবান্তর ঘটিয়াছে, তাঁহার তাড়নায় তাহারা ভয় পাইয়াছে। তাহাদের পরস্পারের মধ্যে সদ্ভাব দেখিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব আমিনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। হায়! সহৃদয়তার আচ্ছাদানে, সরলতার আবরণে সংসারে কত হৃদয়ের কুটিলতা, বিদ্বেষের বিষম বিষ এবং শত্রুতার শাণিত ছুরিকা যে ঢাকা থাকে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে!

সকলে গৃহে উপস্থিত হইল। ফুলকুমারী এবং চাঁদমণি আমিনার চাঁদপানা মুখের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল। ভাবিল, —"আমরা রূপের গর্ব্ব করি বৃথা! ইহার নিকট কি আমাদের রূপ—ইহার কাছে কি আমাদের সৌন্দর্য্য। হায়-হায় এই হত-

ভাগিনীই আমাদিগকে পথে বসাইবে! বুড়বয়সে এ নবীনার নবরসে মজিলে কি আর আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবে? এ কালসাপিনী কোথা হইতে আসিল!”

খাঁ সাহেব যদি সেইসময়ে ফুলকুমারী বা চাঁদমণির মুখের দিকে চাহিতেন, তাহা হইলে তাহাদের চঞ্চলনয়নে এবং ললাটের স্ফীত শিরায় তাহাদের অন্তর মধ্যে সপত্নী-বিদ্বেষের যে তীব্র হলাহল উদ্গীরিত হইতেছিল, তাহার কতকটা আভাস পাইতেন!

সে যাহাহউক সাময়িক অনুষ্ঠানের কোনই ত্রুটী হইল না। মনের ভাব গোপন রাখিয়া, হৃদয়ের কালিমা চাপা দিয়া নববধূর সহিত হাঁসিয়া কথা কহিতে, তাহার সহিত সরস আলাপ করিতে কেহই ভুলিল না। আমিনা—বালিকা, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা, এ দুচ্ছেদ্য কুটিলতা ভেদ করিতে পারিল না। সপত্নীযুগলের অধরে হাসি দেখিয়া, মুখের ভালবাসা পাইয়া, তাহাই প্রকৃত ভাবিয়া, তাহাদের সহিত আমোদ-আহ্লাদে প্রমত্ত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নবাব-দরবারে

প্রভাতে উঠিয়াই কাসিম আলি নবাবের দরবারে যাইবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। যথাসম্ভব সত্বর বেশভূষাদি সমাপন-পূর্ব্বক দুর্গমধ্যে উপনীত হইলেন। তথায় যে সকল অভিনব আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ভীমদর্শন বজ্রনাদী কামান কোথায় সজ্জিত—কোন

স্থানে পর্ব্বতাকারে গোলা-গুলি রক্ষিত—কোনস্থলে হাজারে-হাজারে সেল, তরবারি, বর্ষায় একত্র সমাবেশ। এ-সকল দৃশ্য কাসিমের চক্ষে নূতন। যুদ্ধাস্ত্র দেখিয়া তাঁহার বীরহৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কত পদাতি, অশ্বারোহী, গজবিহারী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তিনি সেইসকল সন্দর্শন করিতে-করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার পরই বাজার। বাজারে দেশ-বিদেশের কত লোক কেনা-বেচা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সে-সকল অতিক্রম করিয়া, সাদী-সৈন্যের অধ্যক্ষ আবদুল রহমন খাঁর অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দৌবারিক তাঁহার আগমন-বার্ত্তা প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিতে গেল।

খাঁ সাহেবের অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কাসিম আলি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। এই অট্টালিকার মধ্যেই আমিনা— সেই লোকললামভূতা, অপূর্ব্ব রূপসী বাস করিতেছেন। তাঁহার রূপ তাঁহার অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি অপরের বিবাহিতা পত্নী—তাঁহার স্বামী তাঁহার বন্ধু, তাঁহার সহায়, তাঁহার হিতৈষী তথাপি তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহতরি যেমন তদভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া বারিধির অতল জলে ডুবিতে থাকে, মানবও তদ্রূপ রূপের আকর্ষণে মোহের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া নরকের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। রূপমোহের আরও একটী ধর্ম্ম আছে। যে যাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করে, সে তাহার হৃদয় আরও অধিকার করিয়া বসে। কাসিম আমিনাকে যতই হৃদয়-ছাড়া করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, তাহার অতুল রূপের প্রতিবিম্ব শয়নে, স্বপনে, অশনে,

উপবেশনে তাঁহার হৃদয়ে ততই গাঢ় হইয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

কাসিম আমিনার সেই মুখখানি ভাবিতেছেন, আর এক-একবার গবাক্ষের দিকে চাহিতেছেন,—আশা, যদি সেইসময়ে আমিনা বাতায়ন-সন্নিধানে আসেন, আর একবার তাঁহার বদন-সুধাকরের সুধা পান করিয়া, তাঁহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার শান্তি করিবেন। এইভাবে চাহিতে-চাহিতে একবার যেন তাঁহার মনে হইল, একটী বাতায়নের দ্বার ঈষৎ-উন্মুক্ত হইল। তিনি পুনঃ-পুনঃ সোৎসুক-নয়নে সেইদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। গবাক্ষ-দ্বার অল্প-অল্প করিয়া মুক্ত হইল—সেই উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে—নীরদশূন্য গগনতলে শারদ-শশাঙ্কের মত সুন্দর একখানি মুখ প্রকাশিত হইল। এ সুন্দর মুখের অধিকারিণী তাঁহার হৃদয়-বিহারিণী আমিনা নয়—অপরিচিতা অপরা কোন কামিনী। যুবতী চঞ্চলকটাক্ষে মুগ্ধ যুবকের প্রতি একবার চাহিয়াই—প্রফুল্ল পঙ্কজবৎ মুখপদ্মে একবার মাত্র হাসিয়াই বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিল। ঠিক সেইসময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং কাসিম আর অধিক ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না।

তাঁহারা উভয়ে প্রাসাদ-দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সভাগৃহের শোভা এবং উপস্থিত জন-সাধারণের বেশভূষা দেখিয়া কাসিমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রশস্ত-কক্ষ—সুন্দর বহুমূল্য জাজিমের দ্বারা আবৃত। মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ মসৃণ গালিচা দ্বারা সমাবৃত, তাহার উপর নবাবের বসিবার আসন। খাঁ সাহেবের আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, নবাব পূর্ব্বেই সভাস্থ হইয়াছেন।

দরবারের দ্বারদেশে সশস্ত্রপ্রহরী—খাঁ সাহেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। খাঁ সাহেব কাসিমকে সঙ্গে করিয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন—এবং নবাবের প্রতি যথা-যোগ্য সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট-আসনে উপবেশন করিলেন। নবাব তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, সমভিব্যাহারী যুবকটী কে অনুসন্ধান করিলেন। খাঁ সাহেব কাসিমের পরিচয় দিয়া, তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য এবং মহত্ত্বের কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—"কাসিম তরবারি-করে আপনার রাজচ্ছত্রতলে আশ্রয় হইতে আসিয়াছে।"

কাসিমের সুন্দর আকৃতি, সারল্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং বলদৃপ্ত শৌর্য্যময় গঠন নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। কাসিম মঞ্চতলে উপস্থিত হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন। নবাব তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া, বিশেষ সুখী হইয়া কহিলেন,—"আমি তোমাকে আমার অশ্বারোহী সেনাদলের একসহস্রের অধিনায়ক করিয়া দিলাম, তুমি তোমার হিতৈষী বন্ধু, প্রবীণ খাঁ সাহেবের অধীন থাকিয়া শিক্ষালাভ করিবে। আশা করি তোমার শৌর্য্য এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উত্তরোত্তর তোমাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিবে।"

কাসিম আলি পুনরায় কুর্ণিস করিয়া যুক্তকরে কহিলেন,—"হজরৎ! আপনার এ-দাস প্রাণপণে আপনার কার্য্যসাধন করিবে। কোনরূপেই আমি আপনার এ-অনুগ্রহ এবং বিশ্বাসের অপব্যবহার করিব না।"

বেতনোর শাসনকর্ত্তা খাঁ সাহেবের হস্তে যে-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তাহা নবাবের সম্মুখে ধরিলেন। নবাব বিশেষ

মনোযোগের সহিত পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে বন্দীদের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। পত্রপাঠ শেষ হইলে নবাব অনুচ্চস্বরে কহিলেন,—"কাপ্তেন হার্ব্বার্ট স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শী—দুর্গনির্ম্মাণ, পরিখাখনন, ব্যূহরচনায় সুনিপুণ এবং রণচাতুর্য্যেও সুপণ্ডিত। বিসমোল্লা! আল্লা আমাকে জীবনরক্ষার এবং সংহার করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি এই ফিরিঙ্গির জীবনরক্ষা করিব। একজন ইহাকে আমার সম্মুখে হাজির কর।"

মুখ হইতে আদেশ বাহির হইতে না হইতে দুই-তিনজন কাপ্তেন হার্ব্বার্টকে আনয়ন করিতে ছুটিল। সকলে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবিলম্বে চোপদার কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া দরবারে উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিধেয় বসন মলিন—স্থানে-স্থানে ছিন্ন, মস্তক অনাবৃত, চরণ পাদুকাশূন্য। অনাহারে, অযত্নে, লাঞ্ছনা পীড়নে শরীর কৃশ—মুখবর্ণ নিষ্প্রভ, চক্ষু কোঠরগত, প্রশস্ত ললাটে চিন্তার রেখা অঙ্কিত। কাসিম তাঁহাকে চিনিলেন। বেতনোর দুর্গ হইতে বাহির হইবার সময়ে যাহাকে প্রস্তরাঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই সাহেব। আর পাঠক চিনুন ইনিই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত কাপ্তেন হার্ব্বার্ট, যাঁহার প্রতাপে লালুরের পর্ব্বতন দুর্গে ইংরাজের বিজয় কেতন উড্ডীন হইয়াছিল।

চোপদার তাঁহাকে নবাবের সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিল,—ফিরিঙ্গি! ইনিই আমেদাবাদের অধীশ্বর নবাব হাসন উল্লা—আল্লার প্রতিনিধি। ভূমিষ্ঠ হইয়া ইহাকে সেলাম কর—মঞ্চতলে জানু পাতিয়া উপবেশন কর।"

হার্ব্বার্ট কহিলেন,—"মুসলমান! রাজার প্রতি কিরূপ সম্মান

প্রদর্শন করিতে হয়, তাহাতে আমি অনভ্যস্ত নই। আমি আমার দেশের রাজাকে যেমন ভক্তি করি, নবাবের প্রতিও সেই মান্য প্রদর্শনের কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না।" এই বলিয়া বন্দী নবাবের উচ্চাসনস্থ শ্বেত গালিচার উপর অগ্রসর হইয়া, তাঁহার দেশের আচরানুযায়ী অভিবাদন করিতে উদ্যত হইলেন। ফিরিঙ্গিকে গালিচার উপর পদোত্তলন করিতে দেখিয়া চোপদার তাঁহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিল,—"কাফের! শয়তান! জগন্মান্য নবাবের আসনের উপর পদস্থাপন! বেয়াদব!——"

নিরাশ্রয়, অনাহারক্লিষ্ট এবং পদে-পদে লাঞ্ছিত হইলেও, হার্ব্বাটে তাঁহার জাতীয় তেজের হ্রাস হয় নাই। তিনি হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক চোপদারকে আঘাত করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে বাধা দিয়া নবাব কহিলেন,—"ক্ষান্ত হও সাহেব! আর একজন ঐ উদ্ধত চোপদারকে দশ বেতের ব্যবস্থা কর।"

শ্রীমুখের আদেশ বাহির হইতে না হইতে তিন-চারিজন রক্ষী ছুটিয়া আসিয়া, হতভাগ্য চোপদারকে চাপিয়া ধরিল এবং বলপূর্ব্বক তাহার গাত্রবস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক, সভামধ্যেই তাহার অনাবৃতপৃষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট বেত্রাঘাত করিল। হতভাগ্যের পৃষ্ঠত্বক ফাটিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নবাব বন্দীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"কাপ্তেন হার্ব্বাট! আমি শুনিয়াছি তুমি দুর্গনির্ম্মাণ করিতে জান—দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিতে পার—এবং তোমার রণচাতুর্য্যও যথেষ্ট আছে। আমি তোমার উপর অনুগ্রহপ্রদর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমি তোমার জীবনরক্ষা করিলাম, তুমি আমার অধীনে কর্ম্ম স্বীকার কর, আমি তোমাকে একদল অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক

করিয়া দিব—প্রচুর পরিমাণে ধনরত্নাদি দিব—সুখ-স্বচ্ছন্দে ধন-সম্পদে গরীয়ান হইয়া আমার রাজ্যে বাস করিবে। এ-কারা-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবে। ধন-রত্ন, মান-সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা, সুন্দরী-রমণী,—মানব-জীবনে যাহা কিছু কাম্য, তোমার করতল-গত হইবে।"

নবাব আরও বলিতে যাইতেছিলেন, হার্ব্বার্ট বাধা দিয়া কহিলেন, —"নবাব সাহেব! মুমূর্ষুর নয়ন-প্রান্তে কেন আর ভবিষ্যতের আশাময় ছবি ধারণ করিতেছেন? আমার সম্মুখে ও-সকল প্রলোভন অনেকবার ধরা হইয়াছিল, আমি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও ও-সকল ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেছি। আমি জানি আপনার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিলে, আমার মৃত্যু অনিবার্য্য—আপনারও বোধ হয় জানা আছে, ইংরাজ-জাতি মরিতে কুণ্ঠিত নয়! আমি হাসিতে-হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব—বুক পাতিয়া ঘাতকের আঘাত লইব, তথাপি স্বজাতিদ্রোহী হইয়া কখনই ও-সকল ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইব না। নবাব! বীর হইয়া, বীরের ধর্ম্ম জানিয়া, কেন বীরত্বের অপমান করিতেছেন। আমি সহস্র বার মরিব, তথাপি শত্রুর অধীনতা স্বীকার করিব না।"

বন্দীর তেজদৃপ্ত উক্তি শুনিয়া কাসিম আলির হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। বুঝিলেন এই গুণেই ইঁহারা সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবেন। নবাব অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে কহিলেন,— "তোমাকে তিনদিন সময় দিলাম। তুমি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ। তুমি যুবক, রণকুশল, সুপণ্ডিত—কেন অকালে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ? তোমার জীবনের এখনও কোন সাধই মিটে নাই— আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন না করিয়া সাধে কেন মরণকে বরণ করিতেছ?"

বন্দী বিষণ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"নবাব! বাঁচিতে আর সাধ নাই। তোমার কারাগারের সুখ-সম্পদে আমার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে। অনেক আত্মীয়-স্বজন, বহু স্বদেশবাসী বন্ধুকে তোমার নিষ্ঠুরতার ফলে কালের কবলে শয়ন করিতে দেখিয়াছি। আমি অনেক পূর্ব্বেই আমার আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে মরিয়াছি। পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু,—"এইসময়ে একবিন্দু অশ্রু তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া, গণ্ড বহিয়া পড়িল। বন্দী ক্ষিপ্রহস্তে তাহা মুছিয়া কহিলেন,— "আমি মরিয়াছি ভাবিয়া অনেকে শোক করিয়াছে—এতদিনে হয়ত আমাকে ভুলিয়াছে,—তাঁহাদের সে লুপ্ত-স্মৃতিকে আর জাগাইতে বাসনা নাই।"

নবাব তীব্রস্বরে কহিলেন,—"ফিরিঙ্গি! মৃত্যুই কি তবে বাঞ্ছনীয়? আচ্ছা তাহাই হইবে! কি মৃত্যু জান——"

বাধা দিয়া বন্দী কহিলেন,—"জানি নবাব! জানি! তোমার নৃশংসতার কথা জগতে কাহার অবিদিত আছে? ফিলিপ তোমারই আদেশে বিষভক্ষণে প্রাণ হারাইয়াছে। আমার স্বদেশবাসী শত-শত বীর তোমারই আজ্ঞায় পর্ব্বত-শীর্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া মরিয়াছে! কত নিরপরাধ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে! জানি—সবই জানি! আমিও তোমার মত নৃশংস, কদাচার নৃপতির করে অন্যপ্রকার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা রাখি না! শেষবার বলিতেছি আমি বিশ্বাসঘাতক, পরপীড়ক, বিধর্ম্মী নবাবের দাসত্ব অপেক্ষা শয়তানের দাসত্ব স্বীকার করিতে সহস্রবার সম্মত আছি।"

নবাবের মুখখানা বর্ষার জলভরা মেঘের মত আঁধার হইয়া উঠিল। আপাদ-মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। বিঘূর্ণিতনয়নে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"আমেদাবাদবাসী কি এতই নিস্তেজ

হইয়াছে? কাহারও হাতে কি তরবারি নাই? আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাফের আমার অপমান করে! বড়ই আশ্চর্য্য! এখনও ইহার স্কন্ধের উপর মস্তক বর্ত্তমান রহিয়াছে!”

নবাবের মুখ হইতে এইকথা বাহির হইতে না হইতে অন্যূন শত-তরবারি কোষমুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিল! শত-কৃপাণের শত আঘাত এককালে হতভাগ্য বন্দীর দেহ শত-খণ্ডে বিভক্ত করিতে উদ্যত হইল। হার্ব্বার্টের নীলনয়ন উজ্জ্বল—কিন্তু বক্ষঃ কাঁপিল না—মুখের ভাবান্তর ঘটিল না কিম্বা চক্ষের পলক পড়িল না। কাসিম আলি বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া ঊর্দ্ধীকৃত শত-তরবারির নিম্নে বন্দীর জীবনরক্ষা করিবার জন্য, বাহু প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সদম্ভ গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—“ধিক্-ধিক্ তোমাদিগকে! শত ধিক্ তোমাদের বীরনামে! একজন অসহায় নিরস্ত্র বিদেশীকে সংহার করিবার জন্য শত-হস্ত উত্তোলিত! কেহ কি এখানে নাই—এমন বীর কি কেহ নাই যে বীরের সম্মান রক্ষা করে?”

কাসিমের তৎকালীন রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়নের তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া, যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে, উত্তোলিত শত-কৃপাণ আপনা হইতে নামিয়া পড়িল। অন্যের কথা দূরে থাক্ স্বয়ং নবাব পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া, কাসিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, নবাব কহিলেন, —“নির্ব্বোধ যুবক! এই কি তোমার কার্য্যের প্রারম্ভ! এইরূপে কি তুমি রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবে?”

কাসিম নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে কহিলেন,—“আল্লার প্রতিনিধি। আমি আপনার আদেশের অন্যথাচরণ করিয়া অন্যায়

কার্য্য করিয়াছি সত্য—তাহার জন্য আমার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিবেন, আমি অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আজি যদি ঐ নিঃসহায় ইংরাজ-বন্দী সামান্য শৃগাল-কুক্কুরের মত এইস্থানে শত-খণ্ডে বিভক্ত হইত, তাহা হইলে আপনার নামে চিরদিনের জন্য একটী কলঙ্কের রেখা পড়িয়া থাকিত। আপনার শুভ্র যশধবলতাকে সেই কলঙ্ককালিমা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই আমি এ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার অপরাধের দণ্ড দিন।"

এই বলিয়া কাসিম আলি মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সভাসদবর্গের মধ্যে অনেকেই এমন কি খাঁ সাহেব পর্য্যন্ত তাঁহার পরিণাম চিন্তা করিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। সকলে নবাবের আদেশ শুনিবার জন্য সোৎসুকনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা নবাবের গম্ভীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সস্নেহবচনে কহিলেন,—"উঠ যুবক! বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, আমি তোমার কার্য্যে বরং প্রীত হইয়াছি। তোমার অপরাধ যতই গুরুতর হউক, তোমায় ক্ষমা করিলাম। রণক্ষেত্রে তোমার সৎ-সাহসের এইরূপ পরিচয় পাইলে আমি আরও সুখী হইব।"

সভামধ্যে একটা গুঞ্জন-শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই নবাগত যুবকের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কেবল জাফর খাঁর মুখে একটা পৈশাচিক ভাবের ছায়া পড়িল।

নবাব বন্দীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"ফিরিঙ্গি! তোর অভিশপ্ত জাতি জাহান্নমে যাউক!" তাহার পর জাফর খাঁকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"জাফর! তুমি আজই ইহাকে লইয়া

নন্দীপুর অভিমুখে রওনা হও—সর্ব্ব-উচ্চ শিখর হইতে উহাকে নিক্ষেপ করিবে! যাও, শীঘ্র লইয়া যাও!”

জাফর খাঁ ব্যাঘ্রবৎ লম্ফপ্রদান করিয়া কাপ্তেন হার্ব্বাটকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বন্দী একবারমাত্র কাসিমের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা যেন মুখর হইয়া বলিতেছিল,—“বিদায়! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্ল্লভ! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।”

জাফর খাঁ হার্ব্বাট এবং অপরাপর ইংরাজ বন্দীকে লইয়া সেই দিনই নন্দীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নন্দীপুর দুর্গ

কাপ্তেন হার্ব্বাট সহচর বন্দীগণের সহিত রক্ষীপরিবৃত হইয়া নন্দীপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে তাঁহাদিগের কষ্টের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য মনুষ্যকল্পনায় যতদূর অত্যাচার সম্ভবে, নিষ্ঠুর-হৃদয় জাফর খাঁ তাহার কিছুমাত্র বাকী রাখে নাই। অবশেষে নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাফর খাঁ হার্ব্বাটকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল,—“কাপ্তেন সাহেব! তোমার নসিব বড় ভাল, নবাব এখনও তোমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন। তুমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হও।”

হার্ব্বাট পূর্ব্বের ন্যায়ই বলিলেন,—“আমি নৃশংস যবনরাজের নিকট ক্ষমার প্রার্থী নহি। আমার এ উন্নত মস্তক কখনই নবাবের চরণতলে লুণ্ঠিত হইবে না।”

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া জাফর কহিল,—"হয় কি না শীঘ্রই দেখা যাইবে।"

সেদিন আর কোন ঘটনা ঘটিল না। পরদিন প্রভাতে জাফর খাঁর আদেশে বন্দীগণকে পর্ব্বতের শিখরদেশে লইয়া যাওয়া হইল। জাফর হার্ব্বাটকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"কাপ্তেন সাহেব! বুঝিয়াছ তোমাদিগকে এখানে কেন আনিয়াছি?"

হার্ব্বাট অকম্পিত, স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন,—"জানি, তোমার সদাশয় নবাবের বিজয়কেতন উড্ডীন করিবার জন্য।"

তখন পর্য্যন্ত ইংরাজ-সেনাপতির মনের তেজস্বীতা দেখিয়া জাফর খাঁ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহার কথার আর কোন উত্তর না দিয়া স্বীয় অনুচরদিগকে যাবনিক ভাষায় কি কহিলেন, হার্ব্বাট তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আদিষ্ট অনুচরবর্গ একজন ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে লইয়া গেল। সে স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। সেইস্থান হইতে অধঃপ্রদেশে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে, মনের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। বালার্কের তরুণ ভাতি তখন পর্য্যন্ত সেখানে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। নিশার অন্ধকার তখনও আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—কুয়াসার ধূসর আবরণ বালসূর্য্যের প্রতিভাকে তখনও আচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই আধ-অন্ধকার, আধ-আলোকিত স্থানের নিম্নপ্রদেশে কি আছে, তখনও দেখা যাইতেছিল না। কেবলমাত্র মধ্যে-মধ্যে বিবদমান হিংস্র জন্তুর কোলাহল কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল। রক্ষীবর্গ ধরাধরি করিয়া বন্দীকে উত্তোলনপূর্ব্বক সেই স্থানে লইয়া গেল এবং শূন্যে তুলিয়া ধরিল। বন্দী অন্তিম সময় উপস্থিত বুঝিয়া, উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিল, মুখে কিন্তু কোনই

ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল না। দুর্বৃত্তেরা তাহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিল। কুজ্ঝটিকা-তমসাচ্ছন্ন গভীর-গহ্বরের তমোরাশি বিলোড়িত করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য গুরু দ্রব্যের পতনশব্দ এবং মুমূর্ষুর মর্ম্মস্পর্শী একটা আর্ত্তনাদ কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। হার্ব্বার্ট প্রভৃতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই গহ্বরের দিকে একবার দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহাদের আকুল দৃষ্টি তাহার তল পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইল না।

এইসময়ে আর এক ঘটনা ঘটিল। গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে এক যুবক ছুটিয়া আসিল। জাফর খাঁ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—"তালে খাঁ! এত প্রত্যূষে কোথা হইতে?"

তালে খাঁ কোন কথা না বলিয়া, অঙ্গত্রাণের মধ্য হইতে একখানি মোহরাঙ্কিত পত্র বাহির করিয়া, তাহার হাতে দিল। জাফর খাঁ পত্রপাঠ করিয়া, অনুচরবর্গকে কহিল,—"তোমরা আজিকার মত বন্দীদিগকে লইয়া কারাগারে রাখিয়া দাও।"

তৎক্ষণাৎ আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। পত্রপাঠকালে জাফর খাঁর মুখের ভাব দেখিয়া হার্ব্বার্ট বুঝিলেন, এ-ব্যক্তি নবাবের নিকট হইতে কোন সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। তাঁহার অনুমান মিথ্যা নয়। নবাব তালে খাঁর হস্তে পত্র দিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি তোমার পৌঁছিবার পূর্ব্বে হার্ব্বার্টের মৃত্যু হয়, তোমাকে তাহার জীবনের জন্য দায়ী হইতে হইবে।"

সেইদিবস মধ্যাহ্নে জাফর খাঁ, বন্দীদিগের ভার তালে খাঁর উপর সমর্পণ করিয়া, রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যার সময়ে তালে খাঁ হার্ব্বার্টের কারাকক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিল,—"বন্দি! এখনও যদি তুমি নবাবের অধীনে কার্য্য

করিতে সম্মত হও, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন

হার্ব্বার্ট মুখ তুলিয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন। তালে খাঁ পুনরায় বলিতে লাগিল,—"বন্ধুর উপদেশ শোন—সম্মত হও। এ সংকীর্ণ কারাগারের প্রস্তর-শয্যার পরিবর্ত্তে রাজপ্রাসাদের দুগ্ধশুভ্র কোমল শয্যায় শয়ন করিতে পাইবে, কটূকষায় আহার্য্যের পরিবর্ত্তে রাজভোগ্য বিবিধ খাদ্যে রসনার তৃপ্তিসাধন করিবে, নিত্য তিরস্কার লাঞ্ছনার পরিবর্ত্তে মান-সম্ভ্রম এবং ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া, মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবে।"

বাধা দিয়া হার্ব্বার্ট কহিলেন,—"মুসলমান! মরণ-প্রতিজ্ঞ মুমূর্ষুর সম্মুখে কেন আর সুখের চিত্র আঁকিতেছ? নিরাশ্রয় দুর্ব্বলকে লাঞ্ছিত করিয়া কেন আর হৃদয়ের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিতেছ? আমি তোমার ও-সকল অযাচিত অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহি, যদি আমার উপর একান্তই সদয় হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

তালে খাঁ কোন কথা কহিল না, হার্ব্বার্টও নীরব—তালে খাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দণ্ডায়মান। তালে খাঁ কহিল,—"কি দেখিতেছ?" সাহেব উত্তর করিলেন,—"তোমাকে দেখিতেছি,—বোধ হইতেছে পূর্ব্বে যেন তোমাকে আরও কোথায় দেখিয়াছি।"

তালে খাঁ ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"আশ্চর্য্য নয়! এখন তোমার অভিপ্রায় কি বল? নবাবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখে কাল কাটাইবে না পাহাড়ের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া মরিবে।"

দৃঢ়তাব্যঞ্জকস্বরে হার্ব্বার্ট কহিলেন,—"মরিব!"

"তবে প্রস্তুত হও!"—বলিয়া তালে খাঁ প্রস্থান করিল।

কারা-গৃহের দ্বারে আবার বাহির দিক হইতে লৌহ-অর্গল পড়িল।

হার্ব্বার্ট ভাবিতে লাগিলেন,—"এ-ব্যক্তি কে? কণ্ঠস্বর পরিচিত, মুখও যেন চেনা-চেনা কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি স্মরণ হইতেছে না।" অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহার পর একে-একে সুখের স্মৃতি—মাতা-পিতার স্নেহ—প্রণয়িনীর ভালবাসা—বর্ত্তমানের দুঃখ-লাঞ্ছনা, অত্যাচার পীড়ন মনে হইতে লাগিল। নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। রাত্রি প্রভাতে মরিতে হইবে—সে মৃত্যু অতি ভয়ানক! বীরের বাঞ্ছিত রণক্ষেত্রে মৃত্যু নয়—শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় মরিতে হইবে ভাবিয়া, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! ভাবনায়-চিন্তায়—দেবতার আরাধনায় যামিনী প্রভাত হইল।

পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও সকলকে সেই বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। হার্ব্বার্টও গেলেন। তালে খাঁ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি সাহেব! কি স্থির করিলে?"

হার্ব্বার্ট কহিলেন,—"মৃত্যু!"

তালে খাঁর আদেশে তাহার অনুচরবর্গ একজন ইংরাজ-বন্দীকে ধরিয়া পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ গভীর খাদে নিক্ষেপ করিল। হতভাগ্য চূর্ণাস্থি হইয়া রক্ত বমন করিতে-করিতে প্রাণ হারাইল। তাহার আর্ত্তনাদ পর্ব্বতে-পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। হার্ব্বার্ট তীব্রস্বরে কহিলেন,—"আমি তোমাদের নিকট কখনও কোন বিষয় ভিক্ষা করি নাই—আজ প্রার্থনা করিতেছি, এইবার যেন আমায় নিক্ষেপ করা হয়। আমি আমার সহচরগণের এ-অবস্থা আর দেখিতে পারিতেছি না।"

হাসিয়া তালে খাঁ কহিল,—"সাহেব! তুমি বড়ই হতভাগ্য! তুমি অতটুকু অনুগ্রহেরও পাত্র নও! আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইতে চাহিয়াছিলে মনে আছে?"

হার্ব্বাটের সম্মুখে এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকায় আবরণ বিলম্বিত ছিল, এক্ষণে অপাসরিত হইল। তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন,—"তালে খাঁ—পলাতক সৈন্য—পথপ্রদর্শক—বেতনোর দুর্গ—সকলই মনে পড়িতেছে! শয়তান! তোর অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আমাকে যেমন করিয়া হত্যা করিলে, তোর আনন্দ হয়, তুই করিতে পারিস!"

তালে খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিল,—"ফিরিঙ্গি! মুখে বলা যত সহজ মরা তত সহজ নয়।" তৎপরে অনুচরদিগের প্রতি চাহিয়া কহিল,—"এইবার হতভাগ্যকে নিক্ষেপ কর।"

তিন-চারিজনে হার্ব্বাটকে ধরিল। হার্ব্বাট নির্ব্বাক, নিশ্চল, অন্তিম সময় বুঝিয়া, যেন উপাস্য দেবতাকে দেখিবার জন্যই ঊর্দ্ধ দিকে চাহিলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহাকে ধরিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। চোখে আঁধার দেখিলেন—ধৈর্য্য কোথায় পলায়ন করিল। তালে খাঁ কি ইঙ্গিত করিল,—তাহারা তাঁহাকে খাদের নিকট লইয়া গিয়া কহিল,—"দেখ একবার নীচের দিকে দৃষ্টিপাত কর।" হার্ব্বাট মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিম্নে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সব যেন অন্ধকার, ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিতেছে! শরীরে ঘর্ম্ম দেখা দিল—হার্ব্বাট সংজ্ঞা হারাইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা

তিন দিবসের পর হার্ব্বাটের যখন সংজ্ঞা হইল, চাহিয়া দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র গৃহের এক পরিষ্কার শয্যার উপর শুইয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে তাঁহার রণসহচর দুইজন বসিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতেছে। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—পুনরায় চাহিলেন,—এখনও সেই দৃশ্য। ভাবিলেন,—"তবে কি স্বাধীন হইয়াছি? এত কারাগার নয়! এত মুসলমানের গিরিদুর্গের কারাকক্ষ নয়! তবে আমি কোথায়? সত্যই কি আমি স্বাধীন হইয়াছি?" ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—"জেমস! আমরা কোথায়? আমরা কি স্বাধীন হইয়াছি?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বাধা দিয়া কহিল,—"আপনি বেশী কথা কহিবেন না, চিকিৎসকের নিষেধ। সুস্থ হউন, সকলই শুনিতে পাইবেন।"

হার্ব্বাটের সে-কথা ভাল লাগিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা কোথায়?"

জেমস কহিল,—"বালাপুরে ফকির ফরিদ সাহেবের আশ্রমে!"

হার্ব্বাট আর কোন কথা কহিলেন না, পুনরায় নিদ্রিত হইলেন। চিকিৎসক আসিয়া কহিলেন,—"আর কোন চিন্তা নাই, শীঘ্রই আরাম হইবে।"

হার্ব্বাট মূর্চ্ছিত হইলে, তালেখাঁ শশব্যস্তে তাঁহাকে ভূতলে শয়ন করাইয়া অনুচরবর্গকে জল আনিতে আদেশ করিল। শীঘ্রই তাঁহার

মূর্চ্ছার অপনোদন হইল। হার্ব্বাটের জীবন মরণের ভার তালে খাঁর উপর। তাঁহাকে হত্যা করিবার নবাবের অভিপ্রায় ছিল না, কৌশলে তাঁহাকে বশীভূত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং সেইজন্যই কৌশলী তালে খাঁকে তাঁহার নিকট রাখিয়া জাফর খাঁকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তালে খাঁ হার্ব্বাটকে বশীভূত করিয়া, নবাবের নিকট কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য, তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়াতে তাহার মনে অতিশয় আশঙ্কার 'সঞ্চার' হইল। যদি হার্ব্বাটের কোনরূপ অনিষ্ট বা মৃত্যু ঘটে, তবে তাহার জন্য তাহাকে জবাব-দিহি করিতে হইবে ভাবিয়া, তালে খাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে তাঁহাকে সেস্থান হইতে অপসারিত করিয়া, কারাগারে আর না রাখিয়া, নিজের আবাস-কক্ষে লইয়া গেল। হার্ব্বাট আবার সংজ্ঞা হারাইলেন। তালে খাঁ ভীত হইয়া একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিল। চিকিৎসক আসিয়া সকল কথা শুনিলেন এবং পূর্ব্বাপর অবস্থা বিবেচনা করিয়া বালাপুরে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে হার্ব্বাট নিকটবর্ত্তী বালাপুরে ফকির সাহেবের আশ্রমে নীত হইলেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যার্থ তাঁহার স্বদেশবাসী নিযুক্ত হইল।

বালাপুরে ফরিদ সাহেব নামে এক মুসলমান ফকির বাস করিতেন। তাঁহার এক আশ্রম ছিল। তথায় আর্ত্ত কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই বিপদে আশ্রয় পাইত। ফকির সাহেব কিন্তু তথায় সর্ব্বদা থাকিতেন না—দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতেন এবং সময়-সময় তথায় আসিয়া কিছুকাল থাকিতেন। তালে খাঁ যখন হার্ব্বাটকে লইয়া বালাপুরে উপস্থিত হইল, তখন তিনি তথায় ছিলেন।

তিনি পীড়িত হার্ব্বাটকে তথায় সাদরে গ্রহণ করিয়া, প্রাণপণ-যত্নে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পাছে তালে খাঁকে দেখিলে রুগ্নব্যক্তির মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় চিকিৎসক এবং ফকির তালে খাঁকে বা তাহার লোকজনকে তথায় আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হার্ব্বাট প্রভৃতি একরূপ স্বাধীন হইলেও দূরে সর্ব্বদা সতর্ক-প্রহরী নিযুক্ত থাকিত।

ফকিরের সেবায় হার্ব্বাট শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এখন তিনি বেশ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারেন। এখন আর তাঁহার নিকটে তাঁহার রণসহচরদ্বয়কে রাখিবার আবশ্যক নাই ভাবিয়া, তাহাদিগকে আবার নন্দীপুরে প্রেরণ করা হইল। হার্ব্বাট অন্তরে আঘাত পাইলেন! ফকির তাঁহার মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া, অনেক বুঝাইলেন এবং ধৈর্য্য ধারণ করিতে পরামর্শ দিলেন। ফকিরের সহিত দিন-দিন তাঁহার বন্ধুতা বাড়িতে লাগিল। উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া অনেক সুখ-দুঃখের কথা কহেন—হার্ব্বাটের প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া ফকির কখন কাঁদেন, কখনও রোষপরবশ হইয়া দন্তে অধর দংশন করেন। মাঝে-মাঝে ফকির বলেন,—"সাহেব! আমি তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

হার্ব্বাট ক্রমশঃ বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সহসা একদিন মধ্যাহ্নে তালে খাঁ আশ্রমে আসিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন,—"সাহেব কাল প্রত্যূষে তোমাকে নন্দীপুরে যাইতে হইবে।"

হার্ব্বাট কহিলেন,—"বন্দীর আর স্বাধীনতা কোথায়। যেরূপ হুকুম।"

তাহার পর ফকিরের সহিত তালে খাঁ আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর তালে খাঁ বিদায়-গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে ফকির কহিলেন,—"ঠিক সন্ধ্যার সময়, নদীতটে শিমুলতলায় আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে। বিশেষ প্রয়োজন।"

তালে খাঁ ফকিরের নিকট উপকৃত। কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া, সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিল।

গ্রামের প্রান্ত হইতে নদীতীরস্থ শিমুল বৃক্ষ প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। সন্ধ্যার সময়, এতস্থান থাকিতে, ফকির সাহেব তাহাকে সেই নির্জ্জন প্রদেশে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন কেন, তালে খাঁ তাহার কোনই কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইল না। যাহা হউক, ফকিরকে সে মান্য করে, যখন প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাকে যাইতেই হইবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তালে খাঁ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বালাপুরে আসিল এবং অনুসন্ধানে জানিল ফকির সাহেব আশ্রমে নাই। তালে খাঁ ধীর-মন্থরগমনে ভ্রমণ করিতে-করিতে নির্দ্দিষ্ট-স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তালে খাঁ নদীতটের পথ ধরিয়া, নদীবক্ষে বীচিমালার উত্থান-পতন অবলোকন করিতে-করিতে ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট-স্থানের সমীপবর্ত্তী হইল। এতক্ষণ তাহার মনে কোনই সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সহসা উদয় হইল,—"এরূপ সময়ে এমন স্থানে আসিয়া ভাল করি নাই। আর ফকিরকেই বা আমার ভয় কিসের? তিনি পরম ধার্ম্মিক। এই ত সেই শিমুলতলা কিন্তু ফকির কই? তিনি কি আমার সহিত প্রতারণা করিবেন?"

তালে খাঁ বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া, এই ভাবের কত কথাই ভাবিতেছে, এমন সময়ে তাহার বোধ হইল, অদূরে কে আসিতেছে। সন্ধ্যার আলোক-আঁধারে যতদূর দৃষ্টি চলে, তাহাতে আগন্তুককে তাহার ফকির বলিয়া বোধ হইল না। তালে খাঁর অন্তর পুনরায় সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া উঠিল। অপরিচিত ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী। সন্দিগ্ধ, ভীত, চকিত তালে খাঁ সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

আগন্তুক কোন কথা কহিল না—ধীরে-ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তালে খাঁ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? তুমি এখানে কেন? ফকির সাহেব কোথায়?"

আগন্তুক তীব্রস্বরে কহিলেন,—"আমি তোর যম! আমায় চিনিস না?"

তাহার বিঘূর্ণিত, আরক্তিম নেত্র দেখিয়া তালে খাঁর হৃদয় কম্পিত হইল। বিশুষ্কমুখে কহিল,—"তোমায় কিরূপে চিনিব—পূর্ব্বে ত কখনও দেখি নাই! ফকির সাহেব কোথায়? তিনি আমাকে এস্থানে আসিতে বলিয়াছিলেন,—তাঁহার কি সাক্ষাৎ পাইব না?"

অট্টহাসি হাসিয়া অপরিচিত কহিল,—"পাইবে বই কি!" প্রতিধ্বনি নদীতরঙ্গের কুল-কুলধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে আগন্তুকের হস্তে একখানি শাণিত-ছুরিকা নবোদিত-চন্দ্রমার কিরণে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

তালে খাঁ সভয়ে পশ্চাতে হটিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? এ-অত্যাচারের অর্থ কি?"

আগন্তুক বজ্রমুষ্টিতে তালে খাঁর দক্ষিণ কর চাপিয়া ধরিয়া তীব্র-স্বরে কহিলেন,—"প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!"

"প্রতিহিংসা!"—তালে খাঁ কাতরকণ্ঠে কহিল—"প্রতিহিংসা! আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই! তুমি কে?"

"আমি কে?"—আঘাত করিবার জন্য ছুরি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া, আগন্তুক কহিল,—"শুনিবে আমি কে? আমি বালাপুরের ফকির ফরিদ সাহেব!"

বামহস্তদ্বারা উদ্যত-অস্ত্রের আঘাত নিবারণ করিতে-করিতে তালে খাঁ কহিল,—"না-না, তুমি ফকির সাহেব নও! তিনি পরম দয়ালু। কেন তুমি আমাকে নির্য্যাতন করিতেছ? জান আমি কে? আমি নবাবের কর্ম্মচারী।"

আগন্তুক দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিকটস্বরে কহিল,—"জানি তুই শয়তানের কর্ম্মচারী! পিশাচের কিঙ্কর। জীবনে যত পাপ করিয়াছিস্, একবার তাহার জন্য অনুতাপ কর—এক ফোঁটা অশ্রু ফেল। অনেক পাপের লাঘব হইবে! আর তোর হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া আমি আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিব!"

তালে খাঁ সকাতরে কহিল, "আমায় ক্ষমা কর! আমার জীবন-ভিক্ষা দাও!"

আগন্তুক হতভাগ্য তালে খাঁকে সবলে আকর্ষণ করিয়া কহিল,—"ক্ষমা! জীবন-ভিক্ষা! অপমানিত, হৃতধর্ম্ম, পদ-দলিত শত্রুর করে ক্ষমাভিক্ষা! ক্ষমার অপব্যবহার! পাষণ্ড! মাধবগিরির প্রতি কি বিন্দুমাত্র ক্ষমা দেখাইয়াছিলি? তাঁহার পরিজনবর্গের উপর কি করুণার কণামাত্র বর্ষিত হইয়াছিল? যোগানন্দের প্রতি কোন্ অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলি?"

তালে খাঁ চীৎকার করিয়া কহিল,—"যোগানন্দ! যোগানন্দ কাফের—শয়তান! এখনও তুই জীবিত?"

যোগানন্দ বিকট-চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"হাঁ যোগানন্দ এখনও জীবিত! প্রতিহিংসার বিষ-বহ্নি হৃদয়ে ধরিয়া যোগানন্দ এখনও জীবিত!"

যোগানন্দের মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। উদ্যত ছুরিকা আরও ঊর্দ্ধে উঠিল—তাহার পর চক্ষের পলক ফেলিবার অবকাশ না দিয়া, ভীষণবেগে তালে খাঁর হৃদয়ে আমূলবিদ্ধ হইল। হত-ভাগ্যের মুখ দিয়া আর একটীও আর্ত্তনাদ বাহির হইল না। যোগানন্দ তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন, তালে খাঁর প্রাণশূন্য দেহ বৃক্ষমূলে পতিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার

মাধবগিরি তাঁহার দলবল লইয়া কখনও একস্থানে অধিকদিন অবস্থান করিতেন না। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, বিভিন্নরূপ পরিচ্ছদ ধরিয়া, তাহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিত এবং অবসর পাইলে আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিত।

জয়ন্তীও তাঁহাদের সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিত। তাহারও ছদ্মবেশ। জয়ন্তী কখনও যোগিনী সাজিত,—গেরুয়া পরিয়া অলকদাম পৃষ্ঠে দোলাইয়া দিত, বামকরে কমণ্ডলু ও দক্ষিণকরে ভীমত্রিশূল লইয়া পিতার অনুসরণ করিত; কখনও বা পুরুষবেশ ধরিত। কুন্তলে বেণী বাঁধিয়া মাথায় জড়াইয়া, তাহার উপর গৈরিক পাগড়ি বাঁধিত। পুরুষের মত কাপড় পরিত, অঙ্গত্রাণে কোমলাঙ্গ আবৃত করিত এবং হাতে হাতিয়ার লইয়া কখন অশ্বপৃষ্ঠে, কখন বা পদব্রজে

চলিত। জয়ন্তীর সাহস অসীম,—শস্ত্রপাণি হইয়া একাকিনী দুর্গম গিরিশিরে, পর্ব্বত-কন্দরে, বিজন-কান্তারে এবং তটিনী-তীরে ভ্রমণ করিত। শত্রু পাইলে বাঘিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার স্কন্ধে পড়িত এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অরাতি নিপাত করিয়া চলিয়া আসিত! শোণিতপাতে বা মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে আর তাহার নারী-হৃদয় বিচলিত হইত না।

যখন হাসেনঘর পর্ব্বতের উপর গিরিদুর্গে মুসলমান সৈন্য সন্নিবেশিত এবং পর্ব্বতপাশের নিকট সমতলক্ষেত্রে ইংরাজ-বাহিনী সংস্থাপিত, তখন মাধবগিরি কন্যা ও কতিপয় মাত্র অনুচর লইয়া উক্ত পর্ব্বতের কোন একটী নিভৃত-প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। পর্ব্বতের উপর দুর্গ—তাহার নিম্নে, বহুনিম্নে মাধবগিরির নিভৃত দুর্গম বাসস্থান। পর্ব্বতের উপর হইতে বোধ হয় অতি নিকট কিন্তু পথ সহজ বা সরল নয়। তরুগুল্মলতা এবং প্রস্তররাশিতে পর্ব্বতপথ অতীব জটিল। তিনি যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেস্থান হইতে লতাবিতানের মধ্য দিয়া, প্রস্তর-স্তূপের উপর উঠিয়া দুর্গপ্রাকার, সৈন্য-সমাবেশ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্গ হইতে তাঁহাদিগকে সহজে দেখা যায় না। পর্ব্বত-নির্ঝরিণী ঊর্দ্ধ হইতে প্রবলবেগে পড়িয়া, নদীর আকার ধারণ করিয়া তর-তরবেগে ধাবিত হইতেছে। তাহার বেগ অতীব প্রবল। সেই খরবেগ জলরাশির প্রবল-তাড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রস্তরখণ্ড খসিতেছে এবং নদীগর্ভে পড়িয়া ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপাদন করিতেছে। মাধবগিরির লতামণ্ডপাবৃত কুটীর এই নির্ঝর-নিঃসৃতা নদীর তটভূমেই অবস্থিত।

প্রভাতে বালারুণের সঙ্গে-সঙ্গেই ইংরাজ ও মুসলমানের কামান

গর্জ্জনে পর্ব্বতভূমি কাঁপিয়া উঠিল। মাধবগিরি যুদ্ধের ফলাফল দেখিবার জন্য লতাগুল্মাবৃত প্রস্তর-স্তূপের উপর লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত। সঙ্গে শাণিতশরপূর্ণ তূণীর এবং শরাসন। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ হইল, উভয়পক্ষের অনেক হতাহত হইল। অবশেষে সমরক্ষেত্রের একাংশে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইল। দেখিলেন যোগানন্দ অসিহস্তে রণরঙ্গে উন্মত্ত। তাহার অসি-প্রহারে অরাতি-দল ছিন্নমূল কদলিবৃক্ষের মত পতিত হইতেছে। তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

মানব অবস্থার দাস। অবস্থা বিশেষে মানুষ দেবতা, আবার অবস্থার বিপর্য্যয়ে মানুষ পিশাচ। কিছুদিন পূর্ব্বে যে মাধবগিরি বিনা কারণে সামান্য কীটানু পর্য্যন্ত নিধন করিতে ব্যথিত হইতেন, তিনিই আজ স্বহস্তে নরহত্যা করিতেছেন এবং প্রিয়পুত্রকে নর-রক্ত-পাত করিতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছেন। ইহা অপেক্ষা মানব-জীবনে আর কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে!

অকস্মাৎ মাধবগিরির মুখ মলিন হইল। গিরি-খাতের নিকট যোগানন্দকে দেখিয়া তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুত্রের বিপন্ন-অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, তূণীর হইতে একটী শাণিত শায়ক বাহির করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অব্যর্থ-সন্ধানে জাফর খাঁ ললাটে বিদ্ধ হইয়া, সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পড়িলেন। এদিকে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পদতলস্থ প্রস্তরখণ্ড স্খলিত হওয়াতে যোগানন্দও আর্ত্তনাদ করিয়া পর্ব্বতখাতে পতিত হইলেন। পুত্রের অপঘাত মৃত্যুতে পিতার প্রাণে বিষম-আঘাত লাগিল। তাঁহারও চৈতন্য লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন বসিয়া পড়িলেন। মাথা ঘুরিল, চোখে আঁধার দেখিলেন, অবশেষে সংজ্ঞা

হারাইয়া প্রস্তরভূমির উপর গড়াইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন বা কিরূপে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল, তাহার কিছুই জানেন না। যখন জ্ঞান হইল, চাহিয়া দেখিলেন, তিনি তাঁহার লতা-কুটীরে শায়িত, পার্শ্বে একজন অনুচর বসিয়া চোখে-মুখে জলসিঞ্চন করিতেছে।

এদিকে এইপর্য্যন্ত, ওদিকে প্রভাত হইবামাত্র জয়ন্তী কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, ধীরপদে ভ্রমণ করিতে-করিতে প্রকৃতির রম্য সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় ঝরণা দেখিতে অতি মনোরম। যেস্থানে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি হইতে জলরাশি নিম্নে পড়িতেছিল এবং ভীম-কল্লোল উৎপাদন করিতে-করিতে ফেণপুঞ্জ বক্ষে ধরিয়া ক্রমনিম্নভূমিতে খরবেগে ছুটিতেছিল, জয়ন্তী তাহার নিকটে গিয়া বসিলেন। এই নদী বা পর্ব্বতখাতের পাহাড় অতি উচ্চ। পাহাড়ের উপর বসিয়া নিম্নে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে তবে জল দৃষ্ট হয়। আবার পর্ব্বতখাতের অতি নিকটে যাওয়াও তত নিরাপদ নয়, কারণ সামান্য অসাবধানতাবশতঃ প্রস্তর স্খলিত হইলে তীরারূঢ় ব্যক্তিকেও তৎসঙ্গে নদীগর্ভে পড়িতে হইবে। জয়ন্তী জীবনে মমতাশূন্য, সুতরাং এ-সকল বিষয় অবগত থাকি-লেও তাহাতে দৃক্‌পাত করিতেন না।

জয়ন্তী পূর্ব্বকথিত উচ্চ নদীতটে বসিয়া আপন্ন মনে কত কি ভাবিতেছিলেন। মধ্যে-মধ্যে উত্তপ্ত-দীর্ঘনিশ্বাসপতনে গুরুভার হৃদয়ের উত্থান-পতন বেশ লক্ষ্য হইতেছিল। বেলা অনেক হইল, তথাপি জয়ন্তী তাহার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না। পার্ব্বত্য নদীর খরবেগের দিকে চাহিতে-চাহিতে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার জীবন-নদীও কি অমনিভাবে কালের বক্ষে বিঘ্ন-বাধা

বিদলিত করিতে-করিতে ছুটিতেছে? এ-গতির কি বিরাম নাই? আছে বই কি। নদী অনন্ত-সাগরে মিশিবে—তাঁহারও জীবন-নদী কাল-সিন্ধুতে পড়িবে। নদীর ঐখানেই শেষ। মানব-জীবনেরও কি তাই? ঐখানেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? সুখ-দুঃখ, জালা-যন্ত্রণা, পাপ-পুণ্য সকলেরই কি ঐখানে নিবৃত্তি হয়?"

"না বৎসে! তা হয় না! মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি হয় না!" জয়ন্তী শিহরিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। জয়ন্তী উঠিলেন, পুনরায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন কিন্তু সেই পার্ব্বত্য-ভূভাগে কোন জন-মানবের সন্ধান পাইলেন না। রোমাঞ্চিতকলেবরে যুক্তকরে কহিলেন,—"কে আপনি মহাপুরুষ! আমায় দেখা দিন!—আপনি যেই হউন, আপনি অন্তর্য্যামী, আমার সংশয় নিরসন করুন!"

"সময়ে সবই হইবে বৎসে। সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে!"

আবার পর্ব্বতভূমি মুখরিত করিয়া, সুললিত গম্ভীরকণ্ঠে কোন অদৃশ্য-পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিলেন। জয়ন্তী আভূমিপ্রণত হইয়া উদ্দেশে সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন, তাহার পর পুনরায় সেই নির্জ্জন-নদীপুলিনে বসিয়া চিন্তামগ্না হইলেন। তিনি উদাসনয়নে নদী জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, আপন মনে কত কি বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, নদীগর্ভের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। পর-মুহূর্ত্তে তীর হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িলেন। সেস্থানের জল বেশী গভীর নহে। কিন্তু স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রবল। সন্তরণ দিয়া ভাসমান একটী মনুষ্যকে ধরিলেন। হতভাগ্য মৃত

কি জীবিত বুঝিতে পারিলেন না। বামহস্তের দ্বারা তাহাকে ধরিয়া এবং দক্ষিণহস্তের সাহায্যে সন্তরণ দিয়া নদীর কিনারায় আসিলেন কিন্তু প্রবাহের প্রবলতাবশতঃ একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। নদীর খরবেগ তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সেস্থানে নদীর পাহাড় অনেক উচ্চ, উপরে উঠিবার কোন সুগমপথ ছিল না। জয়ন্তী অপেক্ষাকৃত একটা নিম্ন ঢালুভূমি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নদীর কিনারায়-কিনারায় সেই মৃতবৎ নরদেহ ভাসাইয়া, তাঁহাকে অনেকদূর আসিতে হইল! অবশেষে একটা সুবিধামত স্থান পাইলেন। এস্থানে ধস খাইয়া খানিকটা পাহাড় পড়িয়া গিয়াছে। স্খলিত-মৃত্তিকা এবং প্রস্তরখণ্ড সকল পড়াতে তাহার উপর পা দিয়া দাঁড়াইবারও বেশ সুযোগ হইয়াছিল। জয়ন্তী সেই মৃতবৎ-দেহকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া অতি সাবধানে উপরে উঠিলেন। তাঁহার শরীরে অপরিমিত সামর্থ্য।

জয়ন্তী এখন যেস্থানে উঠিয়াছেন, সেস্থান তাঁহাদের কুটীর হইতে অনেকদূর, সুতরাং তাঁহাকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইল। যুবককে একা রাখিয়া, অপরের সাহায্য আনিতে যাওয়া অসম্ভব, কারণ হিংস্রজন্তুতে অনিষ্ট করিতে পারে; আবার এরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ অচেষ্টিত থাকিলেও যুবকের নির্ব্বাপিতপ্রায় জীবন-প্রদীপ অচিরে নির্ব্বাপিত হওয়ারও সম্ভাবনা। ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া জয়ন্তী তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল নিষ্পীড়িত করিয়া, তদ্দ্বারা যুবকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুছাইয়া দিলেন এবং দেহ হইতে বস্ত্রাদি যথাসম্ভব অপসারিত করিয়া তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। তাহার পর উভয় হস্ত পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইলে, সেই হস্ত ধীরে-ধীরে হতচেতন-যুবকের ললাটে, বক্ষে এবং মস্তকে

বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে পরিচর্য্যা করিবার পর যুবকের দেহ ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। আরও কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে অতিবাহিত হইবার পর তাহার জ্ঞানসঞ্চারের উপক্রম হইতেছে দেখিয়া জয়ন্তীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। ধীরে-ধীরে যুবকের নয়নোন্মেষ হইল, যুবক চাহিয়া দেখিল কিন্তু কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। অবশেষে যখন জ্ঞানের বেশ উদ্রেক হইল, তখন জয়ন্তী অতি-মৃদু স্নেহমাখাস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"দাদা—আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি জয়ন্তী! এখন তোমার কি কষ্ট হইতেছে?"

জয়ন্তীর কথাগুলি যোগানন্দের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার মোহের আবরণ সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকাবৎ অন্তর্হিত হইল। যোগানন্দ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, পারিলেন না! জয়ন্তী কহিলেন,—"দাদা! এখন উঠিবার চেষ্টা করিও না, আর একটু বিশ্রাম কর, নচেৎ এখনই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে।"

ভগ্নীর বাক্যে ভ্রাতা নিরস্ত হইলেন। জয়ন্তী সেখানে সেসময়ে কিরূপে আসিলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার উদ্ধার-সাধন করিলেন, শুনিয়া যোগানন্দের হৃদয় যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। পিতাও নিকটে আছেন শুনিয়া, তাঁহার হৃদয়ে নববলের সঞ্চার হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন।

পাঠক পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন, যোগানন্দ পদনিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড স্খলিত হওয়াতে গিরিখাতে পড়িয়াছিলেন। তিনি যেস্থলে পতিত হন, পর্ব্বতের উপর হইতে তাহার গভীরতা অত্যন্ত অধিক—জলের গভীরতাও নিতান্ত ন্যূন নয়। ঠিক সেইস্থানেই আবার দুই-তিনটা

ঝরণার জল আসিয়া মিশিয়াছে এবং উক্ত-প্রবাহের সহিত একত্র হইয়া ভীষণ-শব্দ করিতে-করিতে ক্রমনিম্নভূমিতে ছুটিতেছে। জলে পড়িবার পূর্ব্বেই যোগানন্দের চৈতন্য লোপ পাইয়াছিল—তিনি জলস্রোতে ভগ্নবৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় ভাসিতে-ভাসিতে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে ক্রমনিম্নভূমিতে আসিয়া পড়িলেন। জয়ন্তী লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেও যোগানন্দের ভাসমান-দেহ তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই, ভ্রাতার উদ্ধারার্থ নদীবক্ষে লাফাইয়া পড়িলেন এবং কিরূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, পাঠক পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন।

জ্ঞানের সঞ্চার এবং দেহ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে, যোগানন্দ জয়ন্তীর সহিত কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সুস্থদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া, মাধবগিরি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইহার পর যোগানন্দ ফকির বেশ ধরিয়া বালাপুরে এক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। বিপদে পড়িলে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই তথায় আশ্রয় পাইত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার শিষ্টাচার, দয়া এবং পরোপকারিতার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। তিনি সকলেরই ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। যে সকল লোক তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইত, সকলেই যে পথিক বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা নহে,—মাধবগিরির লোকও নানাবেশে দেশে-দেশে ভ্রমণ করিতে-করিতে তথায় উপস্থিত হইত এবং তাঁহার সহিত সংবাদের আদান-প্রদান করিত।

ফরিদ সাহেব বা যোগানন্দ তালে খাঁকে নিহত করিয়া, নদী জলে অবতরণপূর্ব্বক শোণিত-চিহ্নাদি বিধৌত করিলেন, তাহার

পর আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একটী গুপ্তস্থান হইতে ছদ্মবেশ বাহির করিয়া পুনরায় ফকির বেশ ধারণ করিলেন।

যখন তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় একপ্রহর অতীত। হার্ব্বার্ট শয়ন করিয়াছেন কিন্তু এখনও তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। আশ্রম বাহিরে প্রহরী থাকিলেও, তিনি কতকটা স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন, এস্থানে তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইত না, বরং ফকিরের সহিত নানা প্রসঙ্গের আলাপে পরমসুখে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। শর্ব্বরী প্রভাতে সে সুখের পরিসমাপ্তি হইবে—ভালে খাঁ কাল তাঁহাকে আবার নন্দীপুরে লইয়া যাইবে—কাল হইতে আবার তাঁহার বন্দীর জীবন আরম্ভ হইবে। হার্ব্বার্ট বিনিদ্রনয়নে শয্যায় পড়িয়া এই সকলেরই আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে যোগানন্দ তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অনুচ্চভাবে কহিলেন,—"সাহেব! কাল প্রত্যূষে নন্দীপুর যাইবে?"

সাহেব উপবেশন করিয়া কহিলেন,—"সেইরূপই আদেশ পাইয়াছি।"

যোগানন্দ। তোমার সহিত আমার সাক্ষাতের আর সম্ভাবনা থাকিবে না।

সাহেব। বোধ হয় না। তোমার মত বন্ধু আমি আর পাইব না।

যোগানন্দ। সাহেব ওকথা এখন থাক, যাহা প্রস্তাব করিতেছি শোন। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আমি তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করিব। এ সুযোগ ত্যাগ করিলে, আর পারিব না।

সাহেব। ফকির সাহেব! সত্য? ঐ-কথা আমারও মনে

জাগিতেছিল কিন্তু সাহস করিয়া তোমায় বলিতে পারি নাই।

যোগানন্দ। বোধ হয় আমি মুসলমান বলিয়া? বাহিরে চারিজন প্রহরী আছে। তাহারা পালা করিয়া, দুইজনে যখন পাহারা দেয়, অপর দুইজনে নিদ্রা যায়। আশ্রমের বাহিরে একটা চালা ঘর আছে, যাহারা অবসর পায়, তাহারা তথায় বিশ্রাম করে বা নিদ্রা যায়; যাহারা পাহারায় নিযুক্ত থাকে, তাহারা দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। এই জাগ্রত-প্রহরী দুইজনাই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায়। ঐ দুইজনকেই নীরব করিতে পারিলে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

সাহেব। তোমার সাহায্য পাইলে ঐ-সামান্য বাধা অনায়াসেই আমরা অতিক্রম করিতে পারিব কিন্তু ফকির সাহেব তুমি আমার জন্য বিপদের আবর্ত্তে কেন ঝাঁপ দিবে? আমি বন্দী, ধরা পড়িলে পুনরায় কারাগারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইব, না হয় তাহার ফলে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। কারারুদ্ধ অবস্থায় পলে-পলে মৃত্যুর কবলে প্রবেশ করা অপেক্ষা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করাও শতগুণে শ্রেয়! কিন্তু তোমার পরিণাম কি হইবে? আমার উপকার করিতে গিয়া তুমি কেন আপনাকে বিপন্ন করিবে? তোমার মত বন্ধু দুর্লভ! না, আমি তোমাকে বিপন্ন করিয়া, আমার স্বাধীনতা চাই না।

যোগানন্দ। সাহেব! আমিও তোমার সহিত এস্থান ত্যাগ করিব। আমার এ অঞ্চলের কার্য্য শেষ হইয়াছে। যদি অদ্যকার উদ্যমে উদ্ধার হইতে পারি, আমার প্রকৃত-পরিচয় তোমাকে দিব।

সাহেব যোগানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষ-কথার

অর্থ ভাল উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর পুনরায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। একখানা কালমেঘে চন্দ্রমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। যোগানন্দ উঠিয়া একখানা অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং একখানা সাহেবের হস্তে দিয়া, তাঁহাকে নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া, নিঃশব্দে দ্বারের সমীপবর্ত্তী লইলেন। কান পাতিয়া শুনিলেন কিন্তু প্রহরীদ্বয়ের জাগ্রতের কোনই লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না। হার্ব্বাট দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধরিয়া যোগানন্দের আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন।

যোগানন্দ নিঃশব্দে দ্বার মুক্ত করিলেন। একজন দ্বারের বাহিরে একখানা টুলের উপর বসিয়াই নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, অপর ব্যক্তি অদূরে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের মূলদেশে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া, নাসিকাধ্বনি করিতে-করিতে কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ইতি-কর্ত্তব্যতাবধারণ করিয়া দুইজনে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত দুইজন নিদ্রিত-প্রহরীর উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং সবলে গলা চাপিয়া ধরিলেন। সহসা আক্রান্ত হইয়া হতভাগ্য প্রহরীদ্বয় চীৎকার করিবার বা আত্মরক্ষার্থ একটী হস্তও উত্তোলন করিবার অবসর পাইল না। দুইখানি ভীষণাস্ত্র যুগপৎ উর্দ্ধে উঠিল এবং পতিত শত্রুর বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইল। দুই-একবার হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়াই, তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। তাহাদের তরবারি এবং বন্দুক দুইটী গ্রহণ করিয়া, যোগানন্দ এবং হার্ব্বাট সেস্থান ত্যাগ করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বালাপুর হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দলিত-ফণিনী

জলের প্রকৃতির সহিত স্ত্রী-চরিত্রের—রমণী প্রকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। জল তরল, চঞ্চল,—নারীহৃদয়ও স্বভাবতঃ অতিশয় চঞ্চল এবং নম্রপ্রকৃতির। জলে যেমন কোন দ্রব্যের দাগ পড়ে না, এই কুসুমকোমলদেহা, নবনীত-নমনীয় কামিনীর কোমল কমনীয় হৃদয়েও কদাচিৎ কাহারও দাগ পড়ে! যাহার পড়ে, সে বড়-ভাগ্যবান। জলে ছায়া প্রতিফলিত হয়,—যতক্ষণ সেই ছায়ার আধার তাহার সম্মুখে থাকে। মূর্ত্তি অপসারিত হইলে, প্রতিফলিত প্রতিবিম্বও জলের হৃদয় হইতে অন্তর্হৃত হয়। প্রণয়াস্পদ যতক্ষণ নিকটে থাকে, ততক্ষণ তাহার প্রতিমূর্ত্তিও রমণী-হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে—প্রিয়জন স্থানান্তরিত হইলে, তাহার মূর্ত্তিও সঙ্গে-সঙ্গে মুছিয়া যায়। জলের গতি নিম্নগামিনী—রমণীর প্রেম-প্রবাহও প্রায়ই নিম্নদিকে ধাবিত হইতে দেখা যায়। কত সুন্দরী সাক্ষাৎ মদনের ন্যায় স্বামীর অগাধ-প্রেমে অবহেলা করিয়া কুদৃশ্য বাটীর কিঙ্করের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তও সংসারে নিতান্ত বিরল নয়। আধার ভিন্ন জলের অবস্থান অসম্ভব—রমণীরও তাই। শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি, বার্দ্ধক্যে পুত্র রমণীর আধার বা রক্ষক। এ-আধার বা রক্ষকের অভাব হইলে, জল বা রমণীর গতির ঠিক থাকে না—যেদিকে সুবিধা পায়, সেইদিকেই গড়াইয়া যায়। আমরা যে সকল যুক্তি দেখাইলাম, ইহা সাধারণ রমণীর

মধ্যেই দৃষ্ট হয়; যাঁহারা রমণীকুলের রত্ন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আমিনা এখন খাঁ সাহেবের অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধা। সে অবরোধের মধ্যে খাঁ সাহেব ভিন্ন অপর-পুরুষের গতিবিধি নাই। স্বতরাং কাসিমের সহিত আমিনার সাক্ষাতের আর কোনই উপায় নাই। তাহা না থাক, উভয়ে কিন্তু উভয়ের হৃদয়ছাড়া একদণ্ডের জন্যও হয় নাই।

যতক্ষণ খাঁ সাহেব আমিনার সহিত অবস্থান করেন, আমিনা ততক্ষণ হাস্যময়ী, ততক্ষণই প্রফুল্লা। খাঁ সাহেবও চলিয়া যান, আমিনার হৃদয়েও একখানি কালমেঘের ছায়া আসিয়া পড়ে, অমনি তাঁহার শরচ্চন্দ্রবৎ প্রফুল্ল-মুখচন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন শশধরের মত মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া আইসে। কাহাকে স্মরণ করিয়া যেন, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে একটী স্বদীর্ঘ-নিশ্বাস বহির্গত হয়।

আমিনার জীবন ক্রমশঃ আরও দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সপত্নীযুগল প্রথম-প্রথম মুখে যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহাদের সে ভাবেরও অভাব হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব আমিনার সরল-স্বন্দর-স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া, যতই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ফুলকুমারী এবং চাঁদমণির ঈর্ষানল ততই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ভাবিয়া, উভয়ের সর্ব্বনাশের বিবিধ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

খাঁ সাহেবকে রাজকার্য্যের অনুরোধে সময়ে-সময়ে দূর-দূরান্তরে যাইতে হইত, তখন ফুলকুমারী বা চাঁদমণি তাহার সহিত আর ভাল করিয়া মিশিত না, তাহারা যেস্থানে বসিয়া হাস্যকৌতুক

করিতেছে, আমিনা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলে, তাহারা নীরব হইত, অথবা তাহাকে নানারূপে উত্যক্ত করিতে চেষ্টা করিত। এই সকল কারণে আমিনাও আর তাহাদের নিকট যাইত না—আপন কক্ষে আপন চিন্তায় বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিত। বৃদ্ধ-পতির অনুরাগ, হৃদয়ের ভালবাসা চিন্তা করিয়াও আমিনা তাহার হৃদয় স্থির রাখিতে সমর্থ হইত না। নারী-জীবনে রমণী যে-সব সুখের কামনা করে,—ঐশ্বর্য্য, সুখ, মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কার, দাসদাসী, পতিপ্রেম—আমিনা সবই পাইয়াছে, তথাপি তাহার হৃদয়ে সুখ নাই, শান্তি নাই। আমিনা একাকিনী হইলেই বিষাদিনী। সুকোমল শয্যাতলে অর্দ্ধশায়িতা আমিনা বামকরতলে বামগণ্ড রাখিয়া, কাহার মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছে, পাঠকের অবিদিত নাই। কি কুক্ষণে কাসিম আলির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল! যদি তাঁহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ না হইত—যদি ঘটনা পরম্পরায় কাসিম তাহার জীবন-পথের মধ্যে আসিয়া না পড়িতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, হতভাগিনী আমিনার জীবন সুখের হইলেও হইতে পারিত। বৃদ্ধ-পতির ভালবাসা বোধ হয় আমিনা অতুল সম্পদ ভাবিয়া, তাহাতেই সুখিনী হইত। কিন্তু তাহা হইবার নয়, ভগবানের বিধান অন্যরূপ।

আমিনার হৃদয় বলবান না হইলেও নিতান্ত দুর্ব্বল নয়। অনেকবার কাসিম আলিকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। সপত্নীযুগলের অত্যাচার যতই বাড়িতে লাগিল, তাহাদের কটূক্তিতে তাহার হৃদয় যতই জ্বলিতে লাগিল, কাসিমের প্রতি তাহার আসক্তিও ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

(৯)

কিয়দ্দিন পরে তাহার ধাত্রী ফতেমা বিবি আসিল। তাহাকে পাইয়া আমিনা কতকটা শান্তি পাইল। ফতেমা একাধারে তাহার জননী এবং সঙ্গিনী। দুঃখের সময় তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিতে, সুখের সময়ে তাহার সুখ-প্রবাহে অঙ্গ ঢালিতে অদ্বিতীয় বন্ধু। আমিনা অজানা বিদেশে অসময়ে ফতেমাকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইল।

এদিকে আমিনার সর্ব্বনাশ সাধনের ষড়যন্ত্র পূর্ণ-উদ্যমে চলিতে লাগিল। ফুলকুমারীর মা প্রায়ই কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। আমিনার প্রতি খাঁ সাহেবের অনুরাগ দিনে-দিনে বাড়িতেছে দেখিয়া, মাতা ও কন্যার অন্তর্দাহের আর পরিসীমা রহিল না। ফুলকুমারীর পরিচারিকা চাঁপা আমিনার প্রবর্দ্ধমান সুখশান্তির সংবাদ অতিরঞ্জিত করিয়া, তাহার গোচর করিত। আমিনা সরলা, চাঁপার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে তাহার হিতৈষিণী ভাবিয়া, তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিত না। খাঁ সাহেব আদর করিয়া কবে তাহাকে কি বলিয়াছে, কবে কোন্ অলঙ্কার দিয়াছে, সবই বলিত। চাঁপার মুখে সেই সকল সংবাদ পাইয়া ফুলকুমারী আপনাকে পরিত্যক্তা ভাবিয়া, আরও বিষাদিতা হইত এবং খাঁ সাহেবের এই অসদ্ব্যবহারের প্রতিশোধ দিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে সংকল্প করিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কাসিম আলি প্রথম যেদিন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া, খাঁ সাহেবের জন্য তাঁহার পুরদ্বারে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইদিন সেইসময়ে অল্পে-অল্পে একটী কক্ষ বাতায়ন ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং সেই অর্দ্ধোন্মাটিত বাতায়নপথে কাহার একখানি সুন্দর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া, নীলনয়নে বিজলী খেলাইয়া এবং অধর

বাধুলীতে হাস্য-তরঙ্গের লীলা দেখাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল—পাঠক বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই। সেই সুন্দর মুখ—সেই হাস্যচ্ছটা-বিভাসিত বিলোল কটাক্ষ বিলাসময়ী ফুলকুমারীর। ফুলকুমারী কার্য্য-ব্যপদেশে গবাক্ষপার্শ্বে আসিয়া কাসিমের রমণীয়মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত এবং পঞ্চশরের শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, বাতায়নদ্বার ঈষৎ মুক্ত, করিল। কাসিমও আমিনার সন্দর্শন লাভের আশায় বারবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছিলেন, সুতরাং সহজেই চারিচক্ষের মিলন হইল। কি যেন কি আসিয়া ফুলকুমারীর ফুলদলকমনীয় কোমলাঙ্গে প্রবেশ করিল—যেন তড়িতের একটা প্রবাহ আসিয়া দেহখানিকে দোলাইয়া দিল—ফুলকুমারী চঞ্চল হইয়া পড়িল—নয়ন-পঙ্কজ আপনা হইতে আরও যেন বিকসিত হইল—চোখে মুখে হাসির তরঙ্গ ছুটিল। সেই তরঙ্গের একটা আঘাত কাসিমের বুকে আসিয়া লাগিল। কিন্তু তত কার্য্যকরী হইল না; কারণ সে সময়ে খাঁ সাহেব বাহির হইলেন, কাসিম তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া, সে-বিষয় আর ভাবিবার তত অবসর পাইলেন না। কিন্তু অনেক সময়ে বিশ্রাম-সুখের মধ্যে সেই বিলোলকটাক্ষময়ী সুন্দরীর হাস্য-তরঙ্গ তাঁহার লালসাময় যুবক-হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত। এ-রমণী যে খাঁ সাহেবের অন্যতমা পত্নী, তাহা তিনি অনুমানে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

খাঁ সাহেবের মুখে এবং লোকপরম্পরায় ফুলকুমারী কাসিমের পরিচয় এবং তাঁহার বীরত্বাদির সংবাদ যতই পাইতে লাগিল, তাহার হৃদয় ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। কাসিমের সৌম্য, শান্ত, সুন্দর মূর্ত্তি সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিল না। শেষে তাহার পরিণাম এই হইল, মনের অবস্থা আর চাপিয়া রাখিতে

না পারিয়া তাহার কিঙ্করী বা সহচরী চাঁপার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল। চাঁপা বিগতযৌবনা হইলেও রসিকা। ফুলকুমারী যদি মরে, তাহাতে তাহার আপত্তি কি? নব-প্রেমের উত্তেজনায় পড়িয়া ফুলকুমারী যদি দিনকতক আত্মবিস্মৃতা হয়, তাহাতে সে বাধা দিবে কেন? সে সম্মতি দিল এবং বিবিধ প্রকারে, তাহার অন্তরে যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল।

চাঁপা খাঁ সাহেবের পত্নীপাতিতার উল্লেখ করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিত,—"পতি যদি তোমায় ত্যাগ করিতে পারেন, তোমার মুখের দিকে যদি তিনি না চাহেন, তুমি যদি তাঁহার আর কেহই নও, তখন তুমিই বা তাঁহার অপেক্ষায় কেন থাকিবে? জীবন-যৌবন ত আর চিরস্থায়ী নয়! যতদিন আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া লও।"

অন্য-সময়ে কি হইত জানি না, এক্ষণে চাঁপার কথাগুলি ফুলকুমারীর বড়ই ভাল লাগিল। মনে-মনে কহিল,—"সত্যই ত যৌবন আর কয়দিন! জোয়ারের জলের মত ঠেলিয়া উঠিয়াছে—ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইলে সব ফুরাইবে। স্বামী যখন আমাকে উপেক্ষা করিল, আমিই বা তাহার আশায় কেন থাকিব? আমিও কাসিমকে লইয়া উন্মত্ত হইব। কি সুন্দর! তাহাকে কি পাইব না? কেনই বা না পাইব? আমারও রূপ আছে—যৌবন জোয়ারের জলের মত, দেহ-নদীতে এখনও তর্-তর্‌বেগে বহিতেছে! রমণীর রূপে মুগ্ধ হয় না, তাহার যৌবন দেখিয়া আত্মহারা হয় না, তাহার ছলনাচাতুর্য্যের নিকট পরাজিত হয় না, এমন পুরুষ ত দেখি নাই! আমি অযাচিতা হইয়া যাইব, না চাহিতেই তাহার করে

আমার যৌবনের ডালি তুলিয়া দিব, সে কি লইবে না? নিশ্চয় লইবে! খাঁ সাহেব! হতভাগ্য বুড়! এইবার হাতে-হাতে তোমায় কুকর্ম্মের প্রতিশোধ দিব! আমায় উপেক্ষা? আমি কালসাপিনী! আমায় ঘাঁটাইয়াছ—আর তোমার রক্ষা নাই! তুমি তোমার আমিনাকে লইয়া থাক, আমি আমার কাসিমকে লইয়া সুখ-সাগরে জীবনতরি ভাসাইয়া দিব।"

যখন খাঁ সাহেবের সংসারের এইরূপ অবস্থা, তখন কাসিম আলিকে কোন দৌত্যকার্য্যের ভার দিয়া, তাহাকে নিজাম রাজ্যে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছিল। তিনি আমেদাবাদে ছয়মাস আসিয়াছেন, ইহারই মধ্যে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যাদিগুণে এবং মধুর স্বভাবে অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন কি স্বয়ং নবাব পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনিই তাঁহাকে কোন রাজকার্য্যের ভার দিয়া, নিজামের রাজধানীতে পাঠাইতেছেন।

কাসিম আলি জানিতেন না যে, তাঁহার পরম সুহৃদ খাঁ সাহেবের অন্তঃপুরচারিণী দুইটী রমণীর-হৃদয় তাঁহার জন্য কতখানি অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তিনি এমন দুইটি হৃদয়ের অধীশ্বর। এইরূপ নিয়মেই জগৎ চলিতেছে! সংসারে কত হৃদয়, কত নয়ন, কতজনের অজ্ঞাতে, তাহাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে, অশ্রুপ্রবাহে শয্যাতল ভাসাইয়া দিতেছে। কতজনের নীরস, শুষ্ক হৃদয়ের বালুকা-স্তূপের মধ্যে যে ভালবাসার অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী প্রবাহিত হইতেছে—কে জানে!

কাসিম আলি দুইটী নারী-হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়া রাজকার্য্যে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

চাঁপা স্বামিনীর পত্র লইয়া কাসিমের বাসায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন। শুনিয়া ফুল-কুমারী কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, নাসারন্ধ্র ঈষৎ কম্পিত হইল।" ফুল-কুমারী আর সামলাইতে পারিল না, ছুটিয়া তাহার প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং শয্যার উপর পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অসংবদ্ধ অলকগুচ্ছ শুভ্র শয্যাস্তরণের উপর পড়িয়া ভুজঙ্গ-শিশুর মত লুণ্ঠিত হইতেছিল—চাঁপা বাতায়ন-ছিদ্রপথে তাহার অবস্থা দেখিয়া, মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কাজের মা

আমেদাবাদের উপকণ্ঠে একটী অনতিপ্রসর গলির মধ্যে কাজের মায়ের কুটীর। আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার অপরাপর ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, আমরা অগ্রে কাজের মায়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীরঙ্গপত্তনের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে একটি গণ্ডগ্রামে খসরু উল্লা নামে এক মুসলমান বাস করিত। চিকিৎসা-ব্যবসায়ের দ্বারা তাহার জীবিকা উপার্জ্জিত হইত। সংসারে স্ত্রী এবং একটী মাত্র কন্যা—নাম মেহের-উন্নিসা। তাহার বয়স যখন দশবৎসর তখন খসরুর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। সে আর দার-পরিগ্রহ করে নাই। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মেহের-উন্নিসা জানিতে পারিল, তাহার পিতার অতুল

বিষয়। কি প্রকারে তাহার পিতা এত বিষয় উপার্জ্জন করিল, তাহা জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হয় নাই। একদিন ঘটনা পরম্পরায় সে জানিতে পারিল, তাহার পিতা কেবলমাত্র ঔষধ ব্যবসায়ী নহে—অর্থ-বিনিময়ে শুধুই যে জীবন দান করে, এমন নহে—প্রাণও হরণ করিয়া থাকে। সাদা-কথায় তাহার পিতা বিষ-ব্যবসায়ী। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার তীব্র-বিষ প্রস্তুত করে,—নানাপ্রকার দ্রব্যগুণ তাহার জানা আছে।

পিতার এই গুপ্ত-বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া, মেহের-উন্নিসা প্রথম-প্রথম হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইল; পিতার উপর রাগ এবং ঘৃণাও জন্মিল। কিন্তু হৃদয়ের সেভাব অধিকদিন থাকিল না। দস্যু সন্তানে প্রায়ই পিতামাতার গুণ বর্ত্তিয়া থাকে।

ক্রমশঃ তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন তাহার বয়স ত্রয়োদশবর্ষ। যৌবনের প্রথম উদ্গমে, বসন্তে লতিকার গায় নব-পল্লব সঞ্চারের ন্যায়, তাহার কলেবরে নব-নব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে লাগিল। খসরু এখনও তাহার বিবাহ দেয় নাই। আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,—আমার কন্যা এখনও বালিকা, বিশেষতঃ আমার সংসারে কেহ নাই, বিবাহ হইলেই কন্যা জামতার ঘরে যাইবে, আমি শূন্যগৃহে থাকিতে পারিব না। দুইদিন যাউক, দেখিয়া-শুনিয়া সৎপাত্রে অর্পণ করিব।”

খসরু কন্যাগতপ্রাণ। মেহের-উন্নিসা আবদার করিয়া বা জেদ করিয়া পিতার নিকট হইতে তাহার সংগৃহীত অনেক বিদ্যা শিখিয়া লইল। অনেক দ্রব্যগুণ, অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ালব্ধ তীব্র-বিষ অল্পদিনে তাহার করগত হইল।

মেহের উন্নিসার যৌবন-সমাগমে যেমন তাহার শরীরের কান্তি

এবং গঠন বৃদ্ধি পাইল, সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাহার হৃদ্বৃত্তিগুলিও সবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ভোগেচ্ছা প্রবল এবং যৌবনসুলভ হাব-ভাব-বিলাসিতাও স্ফূর্ত্তি পাইল। এ-সকল দেখিয়াও খসরু কন্যার বিবাহের কোনই উদ্যোগ করিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খসরুর সংসারে আর অন্য পোষ্য ছিল না,—তবে দাসদাসী অনেক ছিল। তাহাদের মধ্যে আলাদিন নামক অল্পবয়স্ক একটী যুবক ভৃত্য ছিল। সে খসরুর বড়ই প্রিয়, বড়ই বিশ্বাসী,—দেখিতেও পরম সুন্দর। মেহের-উন্নিসার প্রথম যৌবনের ভালবাসা, অতৃপ্ত-হৃদয়ের প্রথম অনুরাগ, বাসনা-বিতাড়িত বিলোল কটাক্ষের প্রথম সন্ধান আলাদিনের উপর পতিত হইল। প্রভু-কন্যার অযাচিত, অভাবনীয় অনুগ্রহের সেও অপব্যবহার করিল না। খসরু কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না।

প্রায় ছয়-মাস পরম সুখে এবং বিনা উদ্বেগে তাহাদের অতিবাহিত হইল। তাহার পর একদিন সে বুঝিতে পারিল, সে গর্ভবতী হইয়াছে। তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—চক্ষের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল। এ কলঙ্ক-কাহিনী কিরূপে গোপন করিবে, কিরূপে এ-দায় হইতে উদ্ধার পাইবে, ভাবিয়া কোনদিকেই কূলকিনারা পাইল না। এই কলঙ্ক-পশরা মাথায় করিয়া কিরূপেই বা পিতার সম্মুখে দাঁড়াইবে—আর কোন্ মুখেই বা তাহাকে মুখ দেখাইবে, যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। আলাদিনকেও কোন কথা জানিতে দিল না, আপন মনেই ইহার একটা উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে-দেখিতে, ভাবিতে-ভাবিতে আরও একমাস কাটিয়া গেল—কিন্তু প্রতিকারের কোনই উপায় স্থির হইল না।

শেষে অনন্যোপায় হইয়া আলাদিনকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। আলাদিন শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—"মেহের-উন্নিসা! আমাদের সুখের দিনের শেষ হইয়াছে। আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না। তোমার পিতা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে, সর্ব্বাগ্রে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। তোমাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারে কিন্তু আমাকে একদিনও জীবিত রাখিবে না। হায়! আমার দশা কি হইবে? তোমাকে কি আমি জন্মের মত হারাইলাম? এ-সুন্দর মুখ কি আর দেখিতে পাইব না?"—এই বলিয়া আলাদিন প্রণয়িনীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিল। মেহের-উন্নিসাও হৃদয়ের উদ্বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রণয়াস্পদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, অশ্রুজলে তাহাকে অভিসিক্ত করিতে লাগিল। অবশেষে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিল,—"আলাদিন আমি কি তোমায় ছাড়িয়া একদণ্ড বাঁচিব? এক লহমার জন্য তুমি চোখের অন্তরালে যাইলে, আমি সংসার অন্ধকার দেখি। বরং এক সঙ্গে দুইজনে মরিব, তথাপি তোমাকে হারাইয়া একদিনও বাঁচিব না।"

আলাদিন মেহের উন্নিসাকে আরও হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া, কহিল,—"বাঁচিবার একমাত্র উপায় আছে, সকল দিকই রক্ষা পাইবে কিন্তু——"

ব্যগ্রকণ্ঠে মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু কি আলাদিন! বলিতে-বলিতে থামিলে কেন? আমার নিকট তোমার অত সঙ্কোচ কেন? যে তোমার করে হাসিতে-হাসিতে জীবন-যৌবন অর্পণ করিয়াছে, যে তোমাকে তাহার হৃদয়রাজ্যের রাজা করিয়া নিত্য তোমার সেবা করিতেছে, তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে অত কুণ্ঠা কেন?"

আলাদিন। বলিতে সাহস হয় না—সে বড় শক্ত কথা, পারিবে কি?

মেহের। তোমার জন্য না পারি কি? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

আলা। এখান হইতে পলায়ন ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। যদি নিজে বাঁচিতে চাও, যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও, তবে এ-স্থান হইতে যত শীঘ্র পার, পলায়নের চেষ্টা কর।

মেহের। পিতার এত ভালবাসার কি এই পরিণাম হইবে! না আলাদিন! তাহা আমি পারিব না। অন্য উপায় থাকে ত বল।

আলা। আর উপায় ত কিছু দেখিতে পাই না! এখানে থাকিলে দুইজনেই মারা পড়িব। তোমার এ-কলঙ্ক আর কতদিন গোপন থাকিবে? লোক জানাজানি হইবে—তোমার পিতা জানিতে পারিলে, আমাদের দেহে অধিকক্ষণ প্রাণ থাকিবে না। তোমার পিতার অর্থের অভাব নাই—কোনরূপে কিছু সংগ্রহ করিয়া, চল পলায়ন করি।

উভয়ের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক কাঁদাকাটি হইল, শেষে আলাদিনেরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার কুলত্যাগ করাই সাব্যস্ত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত, কেবল আলাদিন এবং মেহের-উন্নিসা আপন-আপন কক্ষে জাগ্রত—উৎকণ্ঠিতচিত্তে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। মেহের-উন্নিসার চক্ষে শতধারা বিগলিত। পিতার স্নেহ-মমতায় জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া, কুল-ত্যাগিনী কোন্ অকূলে ভাসিতে চলিল ভাবিয়া, অন্তর্দাতনার

গুরুভারে নিষ্পেষিত। একবার উঠিতেছে, গবাক্ষের নিকট যাইতেছে, আকাশের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আবার শয্যায় গিয়া শয়ন করিতেছে। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল, আলাদিন দ্বারে ধীরে-ধীরে করাঘাত করিল, মেহের উন্নিসা দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। আলাদিন গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"আর বিলম্ব কেন? রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, এখন বহির্গত না হইলে, আর সুযোগ পাইব না।"

মেহের-উন্নিসা একটী বাক্সের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিল,—"এটা লও—আমি বহুক্ষণ হইতে তোমার অপেক্ষা করিতেছি।" বাক্সের মধ্যে কি আছে, আলাদিন জানিত, সুতরাং সাগ্রহে সেটী একহাতে লইয়া, অপর হাতে মেহেরের হাত ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। অতি সাবধানে অতি ধীরে পা ফেলিয়া, তাহারা নীচে নামিয়া আসিল, তাহার পর পূর্ব্ববৎ সতর্কতার সহিত বহির্দ্বার মুক্ত করিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মেহের-উন্নিসা পশ্চাৎ ফিরিয়া আর একবার পিতৃভবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যে-স্থানের সহিত তাহার আবাল্যের স্মৃতি বিজড়িত—যেখানে পিতা-মাতার আদরে, যত্নে, সোহাগে পরিপুষ্ট হইয়া এত বড়টি হইয়াছে, সেইস্থান জন্মের মত ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার বক্ষঃপঞ্জর খসিয়া পড়িতে লাগিল—চক্ষে দরবিগলিতধারে অশ্রু বহিল।

রাত্রির অবশিষ্টাংশ নগরের উপকণ্ঠে কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া যাপন করিল প্রভাত হইবার উপক্রম দেখিয়া, সেস্থান ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী এক গণ্ডগ্রামে গিয়া বাসা লইল। সেস্থানে কয়েক দিবস অবস্থানের পর, পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী গ্রামে যাইয়া বাটী

ভাড়া করিল এবং পরস্পর স্ত্রীপুরুষ বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

যথা-সময়ে মেহের-উন্নিসা একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিল, কিন্তু অষ্টাহ অতীত না হইতেই কালের ফুৎকারে তাহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সব ফুরাইল। প্রথম প্রেমের প্রথম কলিকা মুকুলেই শুখাইল। মেহের-উন্নিসা হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল। প্রণয়ীর সান্ত্বনা-সুধার সিঞ্চনে তাহার হৃদয়-তাপ কতকটা উপশমিত হইল বটে কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র বিপর্য্যয় ঘটিল না।

ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল। মেহের আলাদিনের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ আসক্তা নহে দেখিয়া সেও নিজের পথ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইল। অবশেষে একদিন সুবিধা পাইয়া, মেহের-উন্নিসার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রভাতে সুখনিদ্রার অবসানে মেহের উন্নিসা বুঝিতে পারিল, তরণীর কর্ণধার অকূলে তরণী ভাসাইয়া পলাইয়াছে। তরণী প্রেমাধারের অভাবে অনেক নয়নাসার নিক্ষেপ করিল। তাহার সহিত মনোমালিন্য ঘটিলেও, অভাগিনী মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই, আলাদিন তাহাকে অকস্মাৎ এইরূপে ত্যাগ করিয়া যাইবে। যাহা হউক, হা-হুতাশ ও দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিবার পর শীঘ্রই নূতন কাণ্ডারীর আবির্ভাবের আশায় আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। কিন্তু যখন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে গিয়া দেখিল, রসিক-নাগর রিক্তহস্তে যায় নাই, তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহার মর্ম্ম-বেদনার অবধি রহিল না। হতভাগিনী দেখিল, তাহার যাহা

কিছু সম্বল ছিল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের ভরণ-পোষণ করিতে পারিত, আলাদিন তাহা অপহরণ করিয়া, তাহার অযাচিত প্রেমের প্রতিদান দিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

মেহের-উন্নিসার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখে ক্ষোভে মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হইয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে আলাদিনের চতুর্দ্দশ পুরুষের সদ্গতির ব্যবস্থা করিতে-করিতে উঠিয়া বসিল। সেদিন ঐ-ভাবেই কাটিয়া গেল।

মেহের-উন্নিসার দুঃখে সান্ত্বনা করিবার লোক শীঘ্রই জুটিল। তাহার সুমিষ্ট আলাপে, হৃদয়বেদনার অনেকটা উপশম হইল। রূপ-যৌবনের পণ্যবীথিকায় ক্রেতার অভাব নাই। নব-নাগর রূপ-যৌবনের কিছুদিন সংব্যবহার করিয়া সরিয়া পড়িল। মেহের-উন্নিসার যে দুঃখ, আবার সেই দুঃখ। কিন্তু এবারও তাহাকে বিরহ-যাতনা অধিকদিন ভোগ করিতে হইল না। বসন্তে ভ্রমর ছাড়া কুসুম এবং শরতে মেঘছাড়া নভোমণ্ডল যেমন ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মেহের-উন্নিসার যতদিন রূপ যৌবন ছিল, ততদিন তাহাকে বড় একটা নাগরছাড়া কেহ দেখিতে পায় নাই। শেষে মেহের-উন্নিসা মনের ঘৃণায় ব্যবসায়ে ইস্তফা দিয়া, সে অঞ্চল একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমেদাবাদের উপকণ্ঠে আসিয়া বাস করিতেছে। সে লোকের নিকট নিজেকে কাজের মা বলিয়া পরিচয় দিল, সুতরাং আমরাও তাহাকে উক্তনামে অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হইব না।

কাজের মা অকালেই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিতার নিকট হইতে যে দুই-চারিটি দ্রব্যগুণ শিখিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই তাহার জীবনোপায় হইল। সে পিতৃ-ব্যবসা অবলম্বন

করিয়া কাহারও উপকার, পক্ষান্তরে অপরের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল।

কাজের মা এখন আর কাহাকেও তাহার প্রেম-পাদপের ছায়ায় বসিতে স্থান দেয় কি না, সে বিষয় সবিশেষ আমরা জ্ঞাত নহি, আর পাঠকেরও তাহা অবগত হইবার জন্য বিশেষ উদ্বেগের কোন কারণ দেখি না। সুতরাং গবেষণায় ক্ষান্ত হইলাম। এ-হেন বহুগুণশালিনী কাজের মাকে অকূলের কাণ্ডারী ভাবিয়া, ফুলকুমারীর মা তাহার শরণাপন্ন হইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় কাজের মায়ের কুটীরে ফুলকুমারীর মা আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজের মা পুরাতন খরিদ্দার পাইয়া, এক মুখ হাসিয়া, তাহাকে বসিতে আসন দিল। ফুলকুমারীর মা উপবিষ্ট হইয়া কহিল,—"বোন্! তোমাকে আমার আর একটী কাজ করিতে হইবে।"

কাজের মা তাহার মনোভাব বুঝিয়া কহিল,—"কাজের কথা না থাকিলে ত কাজের মায়ের বাড়ী কাহারও পদধূলি পড়ে না।"

ফুলকুমারীর মা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, একেবারেই কাজের কথা পাড়িয়া বসিল। সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া কাজের মা কহিল,—"ইহার জন্য আর ভাবনা কি! আমি সব ঠিক করিয়া দিব! তবে ভাই! কাজটা বড় শক্ত, অনেক সাধ্য-সাধনার আবশ্যক। পারিশ্রমিকটা কিছু বেশী পড়িবে।"

ফুলকুমারীর মা। তাহা পড়ুক, তাহাতে আটকাইবে না। আসল কাজে সুফল পাইলেই হইল!

কাজের মা। আমার ক্ষমতা ত তোমার জানা আছে—আমি পারি না কি?

ফুলকু-মা। পার বলিয়াই ত তোমার কাছে আসিয়াছি। এখন যাহাতে মেয়েটী রক্ষা পায়, তাহার একটী উপায় কর।

কাজের মা। একটী কাল বিড়াল চাই—তাহার গায়ে একগাছি সাদা লোম থাকিলে চলিবে না। অমাবস্যার রাত্রিতে সেই বিড়ালটী লইয়া আসিবে, তাহার পর যাহা করিতে হয় আমার উপর ভার রহিল।

ফুলকুমারীর মা সে-দিনের মত বিদায় হইল। এবং অমাবস্যা রাত্রিতে একটি কাল বিড়াল লইয়া কাজের মায়ের বাড়ীতে হাজির হইল। আজ আর সে একা আইসে নাই—ফুলকুমারীও সঙ্গে আছে।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর, কাজের-মা মন্ত্রসাধনা করিতে বসিল। প্রথমে বিড়ালটীকে একগাছি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নিকটে রাখিল। তাহার পর পশ্চিমমুখ হইয়া, নিমীলিতনেত্রে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বসিয়া থাকিল। অবশেষে হস্ত-পদ সঞ্চালন করিয়া, নানারূপ মুখভঙ্গিমা সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ মন্ত্রপাঠ করিল। ফুলকুমারী এবং তাহার মা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিয়া তাহার অপূর্ব্ব কার্য্য পদ্ধতি অবলোকন করিতে লাগিল। পরিশেষে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া দক্ষিণহস্তে লইল, এবং বামহস্তদ্বারা বিড়ালের গলা চাপিয়া ধরিয়া, ছুরিখানি তাহার মাথার উপর ঘুরাইতে-ঘুরাইতে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিল :—

আয় চলে আয় আছিস্ কে কোথা,—
দৈত্যিদানা ডাকিনী কাণা,
ব্রহ্মদত্তি মামদো এইখানে এসে
কর্‌বি হানা!

রক্তে করবি স্নান,
মজ্জা করবি পান,
সজ্জা করবি নাড়ীভুঁড়ি,
হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা,
পীরের হুকুম মোল্লার দাড়ি
চলে যা খাঁ সাহেবের বাড়ী,
পীরিতে ছাড়াছাড়ি, দিনেরাতে মারামারি
সতীন হবে আপন, আমিনা হবে পর,
তিনদিনের মধ্যে তুই মর—মর—মর !

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া, কাজের-মা ছুরিকাঘাতে বিড়ালের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং একখানি নূতন সরায় তাহার যাবতীয় রক্ত ধরিয়া, তাহার উপরেই মৃত বিড়ালটীকে স্থাপন করিল। পুনরায় অস্ফুচ্চস্বরে কত কি মন্ত্রপাঠ করিয়া, সরাখানি ফুলকুমারীর মায়ের হাতে দিয়া কহিল,—"এই সরক্ত মৃত বিড়াল সরাশুদ্ধ আমিনার দ্বারে ফেলিয়া রাখিবে, আমিনা শয্যা হইতে উঠিয়াই যদি সর্ব্বাগ্রে উহা দর্শন করে, তবে আর তাহার রক্ষা নাই। তিনদিনের মধ্যে সে নিশ্চয়ই খাঁ সাহেবের বিষনয়নে পড়িবে।"

ফুলকুমারী কাজের-মাকে আশাতিরিক্ত পুরস্কৃত করিয়া, মাতার সহিত, সর্ব্বপ্রথমে তাহার পিত্রালয়ে আসিল, তাহার পর শিবিকা-রোহণে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, রক্তাক্ত ছিন্নকণ্ঠ বিড়ালটীকে সরাশুদ্ধ আমিনার শয়নকক্ষের দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া, নিশ্চিন্তমনে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। খাঁ সাহেব আজ কয়েকদিন হইল রাজকার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন, শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সম্ভাবনা আছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তুকতাকের ফল

তমোহা দিনদেবের আবির্ভাবে তমিস্রা-রজনীর ঘোরান্ধকার নিবিড়ারণ্যে এবং গিরিগুহায় আশ্রয় লইল। পতত্রীকুল প্রভাতী-সঙ্গীতে তপনের রাজ্যাভিষেকবার্তা জগদ্বাসীকে ঘোষণা করিয়া দিল। শস্যশ্যামলা মেদিনী আবার হাস্যময়ী হইল। জলে কমলিনী, স্থলে স্থলপদ্মিনী আবার হাসিল। ভ্রমর নলিনীর মধুপ্রয়াসী হইয়া আবার তাহার নিকট ছুটিল। প্রভাত-পবনে লতিকার নধরশিরে কুসুম কাঁপিল, বৃক্ষপত্রের মন্দ-সঞ্চালনে মৃদু-মনোহর শব্দ উদ্ভূত হইল। পদ্মিনী নাগরের হাটে রঙ্গিনীর ন্যায় কভু বামে, কভু দক্ষিণে হেলিয়া ঢলিয়া পড়িল, শয্যাশায়িনী বিলাসিনীর মুক্ত অলকগুচ্ছের কিয়দংশ বক্ষে, কিয়দংশ তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত শৈবালবৎ মুখপদ্মের উপর আসিয়া পড়িল, কোথাও প্রকাশ্য রাজপথে কলসী-কক্ষ-কামিনীর বক্ষ-বসন অপসারিত হইল।

প্রভাতের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আমিনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ফতেমা পূর্ব্বেই জাগরিত হইয়াছিল। আমিনা নয়ন-পদ্ম উন্মীলিত করিয়া দেখিল, ফতেমা তাহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। আমিনা তাহাকে পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে সস্মিতাননে কহিল,—"ফতেমা! তুমি কতক্ষণ জাগিয়াছ? তুমি সমস্তরাত্র বসিয়া আমাকে বাতাস করিতেছ?"

ফতেমা পাখাখানি রাখিয়া, আমিনার জলদনিবিড়কুন্তলগুচ্ছ,

যাহা নিদ্রাবশে অসংযত হইয়া, কতক কুণ্ডলিতাকারে স্বেদসিক্ত ললাটে, কতক গোলাপী গণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে যথাস্থানে সরাইয়া কহিল,—"না মা! আমি অনেকক্ষণই জাগিয়াছি!"

তাহার পর আমিনা সুখশয্যা পরিহার করিয়া উঠিয়া বসিল। ফতেমা কক্ষবাতায়নে পর্দা টানিয়া দিতে লাগিল। আমিনা ইত্যবসরে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিল। নিদ্রালস, ঘুম-বিজড়িত আঁখি—আমিনার বাম-চরণ কোন অজ্ঞাত কোমল পদার্থের উপর পড়িবামাত্র তাহার নিম্নস্থ পদার্থবিশেষ মর্-মর্ শব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। উষার আলোক-আঁধারে প্রথমতঃ কিছুই দৃষ্ট না হইলেও, তাহার অন্তরে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হওয়াতে আমিনা চীৎকার করিয়া উঠিল। ফতেমা ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে দারুণ বিভীষিকার উদ্রেক হইল। এতাবৎ আমিনা সকল বিষয় ভাল বুঝিতে পারে নাই, এক্ষণে চরণতলে ছিন্নকণ্ঠ, রক্তাক্ত, মৃত-মার্জ্জার নিরীক্ষণে ভয়বিহ্বলা হইয়া ফতেমার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বক্ষে, ললাটে মুক্তাফলের মত স্বেদবিন্দু দেখা দিল। পদতল আর্দ্র বোধ হওয়াতে, হাত দিয়া দেখিল উহা মার্জ্জার-শোণিতে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। সভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল,—"ফতেমা! আমাকে শীঘ্র এখান হইতে লইয়া চল, আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

ফতেমা আশ্বাস দিয়া কহিল, ভয় কি মা! চল তোমায় ঘরের ভিতর রাখিয়া, আমি এ সকল পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।" আমিনার শরীর ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল,—ফতেমা দেখিল, তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে। সে, তাহাকে যত-সত্বর পারিল কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া, শয্যার উপর শয়ন করাইয়া

দিল। আমিনার মাথা উপাধান হইতে গড়াইয়া পড়িল। ফতেমার ব্যাকুল-চীৎকারে অপরাপর পরিচারিকারা আসিয়া জুটিল। একজন গৃহ-চিকিৎসককে সংবাদ দিতে ছুটিল।

যথাসময়ে হাকিম আসিলেন। সুশীতল গোলাপবারি সিঞ্চনে এবং বিবিধ ঔষধাদি প্রয়োগের পর আমিনার সংজ্ঞা হইল কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। সুন্দরী পুনরায় চৈতন্য হারাইয়া সদ্যছিন্ন প্রভাত-পদ্মের মত শয্যার উপর পড়িয়া রহিল। বেলা দ্বিপ্রহরের পর পুনরায় সুলোচনার লোচনযুগল উন্মীলিত হইল। ফতেমা হাতে আকাশের চাঁদ পাইল। বৃদ্ধ হাকিম কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তাঁহার অনুমানই প্রকৃত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমিনার কম্প দিয়া প্রবল জ্বর আসিল। সমস্ত রাত্রি রোগের প্রাবল্যে নানারূপ প্রলাপ বকিতে লাগিল।

খাঁ সাহেবের নিকট লোক প্রেরিত হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে তিনি রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সুন্দরী, তরুণী-ভার্য্যা ঘোর-বিকারে নানারূপ প্রলাপোক্তি করিতেছেন। খাঁ সাহেব মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

তিনি একটু সুস্থির হইলে, ফতেমা মার্জ্জার-ঘটিত তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিল। সকল কথা শুনিয়া এবং ঘটনার পূর্ব্বরাত্রে ফুলকুমারীর মা আসিয়াছিল এবং সে তাহার সহিত পিত্রালয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকেই এই দুর্ঘটনার নায়িকা বলিয়া তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিল। ফুলকুমারী হিসাবে ভুল করিয়াছিল, তাহার দূর-দৃষ্টি এতদূর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। খাঁ সাহেব কুপিত হইয়া তাহার কক্ষাভিমুখে ছুটিলেন এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অব-

কাশ না দিয়াই, কেশাকর্ষণপূর্ব্বক পদাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না! শিবিকা ডাকাইয়া তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার দাসী চাঁপা আমিনার রোগ হওয়ার পর হইতে, ফুলকুমারীর ইঙ্গিতে ফতেমার সাহায্য করিতেছিল। সুতরাং তাহার স্বামিনী বাটী হইতে বহিষ্কৃতা হইলেও সে আমিনার পরিচারিকারূপে আপাততঃ তাহার মহলেই বাস করিতে লাগিল।

এক-মাসের উপর অতীত। আমিনা মৃত্যুর দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সে রোগমুক্তা হইয়াছে, কিন্তু সে-পূর্ব্বশ্রী আর নাই! শীর্ণা—হিমানীর অন্তে পত্রাভরণ-বিচ্যুতা লতিকার মত অতি দীনা, বিশীর্ণা, মলিনা! চক্ষু কোটরগত, মুখবর্ণ বিবর্ণ, কুন্তলরাজী তৈল সংস্পর্শহীন ধূলি-ধূসরিত। মুখে আর সে লাবণ্য নাই, অধরে আর সে বিশ্ববিজয়ী হাস্যরেখা নাই, নয়নে আর সে তেজ নাই, কটাক্ষে আর সে কুটিলতা নাই, কুন্তলদামের আর সে কমনীয়তা নাই, বক্ষের আর সে পীবরতা নাই, নিতম্বেরও আর সে পৃথুলতা নাই, সুতরাং খাঁ সাহেবের মত ইন্দ্রিয়াসক্ত, লালসার চিরদাস, ভোগসুখসর্ব্বস্ব মানবের হৃদয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন কিসে হইবে? আমিনা যতদিন রোগশয্যায় শায়িতা—যতদিন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিতা, ততদিন উত্তেজনাবশেই হউক, অথবা কর্ত্তব্যবোধেই হউক সর্ব্বদা তাহার পার্শ্বে থাকিয়া তাহার সেবা করিতেন। ক্রমশঃ যতই সে, রোগমুক্ত হইতে লাগিল, খাঁ সাহেবের সহানুভূতি বা কর্ত্তব্যানুরাগ, ততই শ্লথ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনিও ততই পাশ কাটাইয়া, দুইদণ্ড বিশ্রামের আশায় চাঁদমণির কক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

চাঁদমণি যথাশক্তি তাঁহার চিত্তবিনোদন করিয়া, তাঁহাকে কতকটা বশীভূত করিয়া ফেলিল এবং সুবিধা বুঝিয়া দুই-একখানি নূতন অলঙ্কারের ফরমাস করিয়া বসিল। অপর দুইজন প্রতিযোগিনীর মধ্যে একজন বাটী হইতে বহিষ্কৃতা, একজন ব্যাধির তাড়নায় সৌন্দর্য্যবিচ্যুতা, সুতরাং চাঁদমণির পক্ষে এখন সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত। বয়োবৃদ্ধা সুচতুরা এমন সুসময়ের সুযোগ পাইয়া, তাহার গাঢ়-প্রেমের জটিল-বন্ধনে খাঁ সাহেবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইল। খাঁ সাহেব আমিনার কক্ষে যাওয়া, একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন।

আমিনা এক্ষণে ব্যাধিনির্ম্মুক্তা হইলেও স্বামীকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়া যার-পর-নাই মনোকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিল। এই দুর্দ্দিনে কাসিম আলিকে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার একান্ত নির্জ্জনকক্ষে কাসিমের সুন্দর-মুখখানি-মাত্র হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া, কতকটা সান্ত্বনানুভব করিতে লাগিল। ফতেমা তাহার মনোভাব অনেকটা অবগত হইতে পারিয়াছে। বিকারের সময় প্রলাপোক্তির মধ্যে দুই-চারিবার কাসিমের নাম তাহার মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। রোগাপনোদনের পর ফতেমা কৌশলে নানাপ্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া, আমিনা যে যুবক কাসিমের প্রতি অনুরক্তা হইয়া পড়িয়াছ, তাহা জানিয়া লইল। জানিয়া প্রথমে শঙ্কিতা, তাহার পর চিন্তিতা, শেষে আহ্লাদিতা হইল। আহ্লাদের কারণ,—কাসিম রূপবান, সাহসী যুবক, তাহার সহিত আমিনার মিলন হইলে মণিকাঞ্চনের যোগ হইবে—আমিনা সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু সে কার্য্য কি সম্ভব? সে সুদিন কি হইবে?

চাঁপাকে আর আবশ্যক না হওয়াতে সে ফুলকুমারীর নিকট

চলিয়া গিয়াছে। তবে এখনও মধ্যে-মধ্যে আসিয়া এখানকার সংবাদ লইয়া যাইত এবং স্বামিনীর গোচর করিয়া আসিত। খাঁ সাহেব তাহার নাম আর মুখেও আনেন না শুনিয়া, ফুলকুমারী পদদলিতা ফণিনীর মত কেবল গর্জ্জিতে লাগিল। মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যা ভুজঙ্গীর মত কেবল গর্জ্জিয়া-গর্জ্জিয়া আপন বিষে আপনার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। কাসিমের প্রতি তাহার অনুরাগ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া, তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিল। খাঁ সাহেবের এ-দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ দিতে হইলে, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইলে, কাসিম আলিকে এক্ষণে তাহার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তিনি এখন স্থানান্তরে। ফুলকুমারী অধীরপ্রাণে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ফুলকুমারীর মাতা তাহার পুত্র রোশন আলির দ্বারা খাঁ সাহেবকে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইবার জন্য দুই-তিনবার নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি অবকাশের অভাব জানাইয়া, সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ফুলকুমারীও দুইখানিপত্র পাঠাইয়াছিল, কিন্তু চাঁদমণির পরামর্শে তিনি তাহার একখানিরও কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। এই সকল কারণে তাঁহার উপর ফুলকুমারীর আক্রোশ আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং জনসমাজে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

এইসময়ে সহরময় এক জনরব প্রচারিত হইল, একদল প্রবল ইংরাজ-বাহিনী বহুসংখ্যক কামান লইয়া আমেদাবাদ অবরোধ করিতে আসিতেছে। সে-সংবাদে নগরবাসী মাত্রেই ভীত এবং

স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কেবল ফুলকুমারীর হৃদয় এই সংবাদে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। যুদ্ধে যদি আমেদাবাদের সৈন্য পরাভূত হয়, খাঁ সাহেবের দর্প চূর্ণ হইবে, আর যদি ইংরাজের একটা গোলা আসিয়া খাঁ সাহেবের বাড়ীতে পরে, তাহার আঘাতে পোড়ারমুখী চাঁদমণি এবং আমিনা মরিবে! কি আনন্দ! আরও একটা গোলা আসিয়া যদি হতভাগ্য খাঁ সাহেবের মাথার উপর পড়িয়া ফাটিয়া যায়! কিন্তু তাহা কি যাইবে? আল্লা কি ততদূর সদয় হইবে? তাহা হইলে কাসিম আলির সহিত তাহার নির্ব্বিবাদে মিলনের পথে কে আর অন্তরায় হইবে? কিন্তু—কিন্তু কাসিম আলি যদি তাহাকে না চায়? রূপগর্ব্বিতা কুন্দদন্তে বিম্বাধর দংশন করিয়া, ফুল্লেন্দীবরনয়নে সম্মুখস্থিত বৃহদ্দর্পণে স্বকীয় প্রতিফলিত প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। সে হাসির অর্থ,—এ-রূপের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে না, এ-সৌন্দর্য্যের পদতলে অবনত হইয়া পড়িবে না, এ-উদ্দাম যৌবনের প্রবলপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবে না এমন পুরুষ কে আছে? সুতরাং কাসিম নিশ্চয় তাহার হইবে। আনন্দের দ্বিতীয় কারণ,—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কাসিমের মত যোদ্ধার নগররক্ষার্থ নিশ্চয় ডাক পড়িবে। কাসিম আমেদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার শরৎশশাঙ্কতুল্য সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া ফুলকুমারী তাহার নয়ন চরিতার্থ করিতে পারিবে। ফুলকুমারী আপাততঃ কল্পনাবলে জাগ্রতে তাহার স্বপ্নরাজ্যে সুখে বিচরণ করিতে থাকুক, মদবিহ্বলা প্রফুল্লা মরালীর মত সূর্য্যকরদীপ্ত আন্দোলিত নদীবক্ষে সন্তরণ দিতে থাকুক, আমরা এই অবসরে বিষয়ান্তরে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তন

গিরিতরঙ্গিণীর সলিল-সমাধি হইতে জয়ন্তী যোগানন্দকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—সে আজ প্রায় এক বৎসরের কথা। তাহার পর বার মাসের পল, দণ্ড, দিন, অনন্তের কোলে মিশাইয়া গিয়াছে কিন্তু জয়ন্তী সেইদিন নদী-পুলিনে উপবেশনকালে, কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য মহাপুরুষের দ্বারা সম্বোধিত হইয়া যে কয়েকটী কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা আজও তাঁহার অন্তরমধ্যে সন্তপ্রতের মত সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। সর্ব্বদা ভাবিতেছেন, কে সেই মহাপুরুষ? কে সেই অলৌকিক ক্ষমতাশালী পুরুষপ্রবর? যিনি তাঁহার অন্তরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তাহার উত্তর দিয়া, তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তিনি কখনই সাধারণ মনুষ্য নহেন। সেই নিভৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশে তাঁহার কণ্ঠের সুললিত, গম্ভীর নিনাদ যে প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়াছিল, সেই প্রতিধ্বনি প্রতিনিয়তই তাঁহার অন্তরমধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল। সেই মহাশক্তিধর মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভের জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

জয়ন্তীর স্বভাবেরও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তিনি এখন সর্ব্বদাই চিন্তামগ্না, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ করেন না। যখনই নির্জ্জনে থাকেন, তখনই মহাপুরুষের সেই কথাগুলির আলোচনা করেন। অদৃশ্য-পুরুষ

সেদিন বলিয়াছিলেন,—"মৃত্যুতেই মানবজীবনের পরিসমাপ্তি হয় না। এ দেহ-নাশের সঙ্গে-সঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণা, পাপ-পুণ্য সব শেষ হয় না!" জয়ন্তী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া ভাবেন, "তবে কি হয়? মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? কেহ বলে স্বর্গে, কেহ বলে নরকে। তাহার জীবিতকালের সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, পাপ-তাপ মরণান্তেও কি তাহার স্বর্গ বা নরক-পথের অনুগামী হয়? হয় বই কি—নচেৎ মহাপুরুষ বলিবেন কেন, সুখ-দুঃখ মরণের সঙ্গে-সঙ্গে ফুরাইয়া যায় না। স্বর্গ, নরক! সে কোথায়? কেহ বলে ওসব কথার কথা। কেহ বলে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ, নরক আছে! কেহ বলে ঊর্দ্ধে—ঐ মেঘলোকের উপরে পুণ্যাত্মার আশ্রম স্বর্গ—আর কোন অজ্ঞাত গভীর প্রদেশের চিরান্ধকারের মধ্যে পাপীর নরকাবাস অবস্থিত। দেহান্তে আমি কোথায় যাইব? কে জানে! বোধ হয় নরকে, কেন না স্বর্গে যাইবার মত কোন কাজ ত করি নাই। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা,—বাল্যকালে, তখনও ভাল করিয়া জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, বিবাহ-বাসরে একবারমাত্র স্বামীর সন্দর্শন পাইয়াছিলাম। সে মুখ এখনও মনে আছে। শুনিতে পাই পতিই নারীর গতি। পতিপূজা করিলেই শ্রীপতির আরাধনা করা হয়। আমি এমনই অভাগ্যবতী, বাল্যকালেই সেই পতির মাথা খাইয়াছি। লোকে বলে বৈধব্য পাপের ফল। আমি বাল্যকালে, সেই সুকুমার বয়সে এমন কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য ভগবান আমাকে এই গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন? কিছুই বুঝিতে পারি না। এ-দুর্জ্ঞেয়-বিষয়ে আমার ক্ষুদ্রশক্তি কোনই ধারণা করিতে পারে না! মহাপুরুষ বলিয়াছেন, সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব। একবার সাক্ষাৎ পাইলে তাঁহার

চরণতলে পড়িয়া এ-সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইব! হায় কত দিনে সে-সুদিন আসিবে!"

জয়ন্তী নির্জ্জনস্থান পাইলেই বসিয়া-বসিয়া এইসকল চিন্তা করেন। তাঁহার জীবনে একটা পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী মহাপুরুষের একটী মাত্র কথায়, কত লোকের জীবন-স্রোতের গতি অন্যপথে ধাবিত হইয়াছে। সকল সময় সকল লোকের সকল কথায় সকলের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে না। হয়ত সেই একই কথা পূর্ব্বে বহুলোকের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃৎ-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। যেকথা হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে না—মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সুরে সুর মিলাইতে পারে না—অন্তরের মধ্যে আত্মা-রামের যে যন্ত্র আছে, তাহার তন্ত্রে আঘাত করিয়া তাহাকে ঝঙ্কৃত করিতে পারে না, সেকথায় কাজ হয় না। সেকথা কর্ণের এক বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্যপথে বাহির হইয়া যায়। জয়ন্তী ঐ-সকল বা ঐ-ভাবের কথা পূর্ব্বেও হয়ত অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছিলেন কিন্তু এবারকার মত একবারও তাঁহার হৃদয়ের সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে পারে নাই। এবার নির্জ্জন নদীপুলিনে চিন্তাচ্ছন্ন জয়ন্তীর হৃদয়মধ্যে অজ্ঞাত কোন পুরুষের উপদেশ-বাণী প্রবেশলাভ করিয়া, তাঁহার চিন্তার সুরে বাঁধা হৃদয়ের সেই তারটী স্পন্দিত করিয়া দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম জয়ন্তীর জীবনে একটী মহা পরিবর্ত্তনের দিন আসিয়াছে।

এতাবৎ জয়ন্তী যে-স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিলেন, তাহাতে যেন একটা অবসাদ দেখা দিয়াছে। অনেকসময় বসিয়া-বসিয়া ভাবেন, তিনি যে-পথে গমন করিতেছেন, সেইটাই কি তাঁহার জীবনের

পথ ? ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা—সংযমশিক্ষা ভুলিয়া, জপ-তপ ছাড়িয়া, পরলোকগত পতিদেবতার স্মৃতির অনুধ্যান না করিয়া, পুরুষের আচরিত প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, কান্তারে কন্দরে, দিনরাত্রি ভ্রমিয়া, তিনি করিতেছেন কি ? এই-কি তাঁহার নারী-ধর্ম্ম ? সংসারে প্রকৃতি-পুরুষের মধ্যে কি কর্ম্মের ভেদাভেদ নাই ! এই-সকল বিষয় যতই আলোচনা করেন, ততই তাঁহার হৃদয়মধ্যে একটা বিতৃষ্ণার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি তাঁহার পিতার দল ছাড়িয়া, দূরে—নির্জ্জনে আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া বাস করেন।

এইভাবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় দিন হইতে প্রায় একবৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে তিনি একবারও তাঁহার পিতার কোন কার্য্যে যোগদান করেন নাই। ইতিমধ্যে মাধবগিরির দল আরও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন সম্মুখযুদ্ধে একদল শিক্ষিত সৈন্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করে। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিয়া, সকলরকম অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, মাধবগিরি এখন নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতেছেন। নবাবসৈন্য তাহাদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য সময়-সময় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের গুপ্তবাসস্থানের সন্ধান না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

একদিন অপরাহ্ণে জয়ন্তী আমেদাবাদ হইতে অদূরে এক অভ্রভেদী ছায়াশীতল গিরিশিখরে বসিয়া, ভক্তিপুষ্পের মাল্য রচনা করিয়া, লোকান্তরিত পতিদেবতার চরণমূলে উদ্দেশে অর্পণ করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে সেই গৈরিক বাস—ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রক্ত-

চন্দনের লেখা—কেশপাশ আলুলায়িত! সম্মুখে কমণ্ডলু এবং ত্রিশূল সংস্থাপিত। নয়ন-যুগল নিমীলিত—বাহ্য-চৈতন্য বিলুপ্ত, ধ্যানস্থ হইয়া পতির স্মৃতির আরাধনা করিতেছেন। দূরে বিপদের কালমেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার মাথার উপর আকাশতল যে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই!

বিংশজন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া জাফর খাঁ বেলা দ্বিপ্রহরের পর দুর্গ হইতে শত্রুর সন্ধান লইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ-পর্ব্বত-সান্নিদেশে উপস্থিত হইয়া, সহসা তাঁহার দৃষ্টি পর্ব্বতশিখরবাসিনী, ধ্যানরতা যোগিনীর উপর প্রপতিত হইল। জাফর খাঁ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন, তাঁহার সহচরগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। চারিজনকে অশ্বরক্ষার্থ সেইস্থানে রাখিয়া, অবশিষ্ট অনুচরগণের সহিত জাফর খাঁ নিঃশব্দে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। জয়ন্তী এখনও ধ্যাননিমগ্না।

সানুচর জাফর খাঁ ক্রমশঃ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। উত্তম-রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, গৈরিকধারিণী একাকিনী। মাধবগিরির দলে এক যোগিনী বাস করে—জাফর খাঁ বা অপরে এইমাত্র জানিত কিন্তু ঐ যোগিনী যে জয়ন্তী, আমেদাবাদের মাধবগিরির দুহিতা, তাহা এতদিন জাফর বা অন্যে জানিতে পারে নাই। না জানিবার দুইটী কারণ,—প্রথমতঃ অপরে ঐ গৈরিকধারিণী যোগি-নীকে দেখিলেও, তিনি যে জয়ন্তী, তাহারা তাহা জানিত না। দ্বিতীয়তঃ এ-কথা জাফর খাঁর কর্ণগোচর হইলেও, তিনি তাঁহাকে এ-অবস্থায় ইহার পূর্ব্বে আর দেখেন নাই। এক্ষণে ধ্যানরতা জয়ন্তীকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার ইঙ্গিতে দুইজন অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া, পশ্চাৎ

হইতে জয়ন্তীর উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তিনি নয়নোন্মীলন-পূর্ব্বক ত্রিশূল গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার উভয়হস্ত বাঁধিয়া ফেলিল।

জয়ন্তী যখন আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ হৃতবল, নচেৎ তাঁহার হস্ত মুক্ত থাকিলে এবং ত্রিশূল গ্রহণ করিবার অবসর পাইলে, বিনারক্তপাতে জাফর খাঁ কখনই তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইতেন না।

একজন অসহায়া ধ্যাননিরতা অবলাকে বন্দিনী করিয়া জাফর সাহেবের দল মহা আস্ফালন করিতে লাগিল। কোন একটা বড় কেল্লা ফতে করিয়া আসিতে পারিলেও বোধ হয় বিজয়ী সেনানী এত গর্ব্ব অনুভব করেন না। জাফর খাঁ ভাবিতে লাগিলেন, এইবার মাধবগিরির দল ধরা পড়িবে। এই শয়তানীর জন্যই তাহাদের এত বল। ইহারই বুদ্ধি-কৌশলে তাহারা পরিচালিত হয়! এই চামুণ্ডার উত্তেজনাবশেই তাহারা রণদুর্ম্মদ হইয়া লড়াই করে। ইহার মুখে তাহাদের গুপ্ত-আড্ডার সন্ধান পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, জাফর খাঁর বুকটা ফুলিয়া পাঁচহাত হইল।

অসি নিষ্কোষিত করিয়া ষোলজন বীরপুরুষ জয়ন্তীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, তথাপি তাহারা নিরাতঙ্ক হইতে পারিল না। ঘন-ঘন ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিল—পাছে পর্ব্বতের কোন নিভৃতপ্রদেশ হইতে জয়ন্তীর অনুচরবর্গ বাহির হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কার ছায়া প্রত্যেকের মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইয়া পড়িল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া জয়ন্তীর অধরে মুহূর্ত্তের জন্য হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। এত বিপদেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। সেস্থানে আর অধিকক্ষণ অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত নহে—বিবেচনা করিয়া, জাফর সাহেব বন্দিনীকে লইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন।

এক্ষণে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া জাফর সাহেব বন্দিনীকে কহিলেন,—"সুন্দরি! কাহার কবলে পড়িয়াছ, বুঝিতে পারিয়াছ?"

অবিচলিতকণ্ঠে জয়ন্তী কহিলেন,—"যাহার অত্যাচারে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেই নর-পিশাচ জাফর সাহেব এবারও আমার বন্ধন-কর্ত্তা।"

জাফর। তোমার বন্ধন মোচন করিয়া দিতে পারি, যদি মাধব-গিরির দলের সংবাদ আমাকে দিতে পার।

জয়ন্তী। সংবাদ লইয়া কি করিবে?

জাফর। তাহাদের সহিত আলাপ করিব।

জয়ন্তী। তাহারা তোমার মত মহাপুরুষের সহিত আলাপ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।

জাফর। তাহারা কোথায় থাকে?

জয়ন্তী। স্থানটার নাম জানি না, দেখাইয়া দিতে পারি।

জাফর। সুন্দরি! জাফর খাঁ এতটা নির্ব্বোধ নয়। এ অঞ্চলে তুমি একা আসিয়াছ, যেস্থানে তোমার দলবল লুক্কায়িত আছে, তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারিলে, তাহাদের সাহায্যে উদ্ধার পাইবে ভাবিয়াছ? তাহা হইবে না। আমি এইস্থানে বসিয়া শুনিতে চাই দস্যুদল কোথায়? দলে কত লোক আছে?

জয়ন্তী। যদি না বলি?

জাফর। তোমার রসনা ছিঁড়িয়া লইব—কটি পর্য্যন্ত মাটীতে পুঁতিরা ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব।

জয়ন্তী। এ-সব কর্ম্মে তোমরা যে খুব অভ্যস্ত, তাহা আমার জানা আছে।

জাফর। তবু তুমি আমার কথায় উত্তর দিবে না?

জয়ন্তী। না।

জাফর। এখনও বলিতেছি জয়ন্তী! ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। তোমার ওই সুন্দর মুখখানা আমাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারিবে না। এখনও ভাবিয়া দেখ তোমার পরিণাম কি হইবে?

জয়ন্তী। যখন তোমার কবলে পুনরায় পড়িয়াছি, তখন আমার পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছি! তোমার মত সদাশয় ব্যক্তির নিকট আমি অন্যরূপ প্রত্যাশা করি না।

জাফর। দেখি কতক্ষণ তুমি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার।

তৎপরে অনুচরবর্গের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তোমাদের মধ্যে জনকয়েক শুষ্ক কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত-অগ্নি কর—অবশিষ্ট কয়জন ঐ-শয়তানীকে ঐ-বৃক্ষের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া, উহার অনাবৃত পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত কর। যতক্ষণ না, আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়, ততক্ষণ প্রহার করিবে—পিঠ ফাটিয়া রক্তধারা ছুটিলেও নিবৃত্ত হইবে না। তাহাতেও যদি কোন কথা না বলে, ঐ-প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া জীবন্ত দগ্ধ করিবে।"

এ-আদেশ যে অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত হইবে, জয়ন্তী তাহা জানিতেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুখে কিন্তু আশঙ্কার কোন চিহ্ন প্রকটিত হইল না। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অবিলম্বে তিন-চারিজন, তাঁহারই বস্ত্রাংশ দ্বারা একটা বৃক্ষ-কাণ্ডের সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিল এবং দ্বিতীয়-আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। জাফর কহিলেন,—"এখনও বল, নচেৎ বেত্রাঘাতে ঐ-কোমলাঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে।"

জয়ন্তী কহিলেন,—"আমি নারীহন্তার নিকট কোন কথা প্রকাশ

করিব না। আপনার তুচ্ছ-জীবনের বিনিময়ে আত্মীয়-বন্ধুর জীবন বিপন্ন করিব না।"

জাফর খাঁর ইঙ্গিত পাইয়া, নির্ম্মম সৈনিক জয়ন্তীর কুসুম-কোমল কলেবরে সপাসপ্ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। জয়ন্তীর কোমল ত্বক ছিন্ন হইয়া রুধিরধারা দর-দরধারে তাহার গৈরিকবসন সিক্ত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। জয়ন্তী এখনও নীরব। অন্তর্য্যাতনায় মুখে কালিমা পড়িল, চোখে জল আসিল, তথাপি মুখ দিয়া একটীও আর্ত্তনাদ বাহির হইল না। জাফর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে?"

জয়ন্তী মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—"না।"

সৈনিক পুনরায় বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল, ঠিক সেই সময়ে সেই পথে আর একদল অশ্বারোহী দেখা দিল। তাহারা কে জানিবার জন্য সকলে সেইদিকে চাহিল। ইতিমধ্যে অভিনব অশ্বারোহীদলের নেতা, সম্মুখে প্রজ্বলিত-অগ্নিশিখা এবং তাহার নিকট কতকগুলি লোককে সমবেত দেখিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে সবলে কষাঘাত করিলেন। আগন্তুক নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন; তাহাতে যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধ এবং ঘৃণার সঞ্চার হইল। দেখিলেন এক বৃক্ষমূলে এক সুন্দরী,-যুবতী-রমণী আবদ্ধা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া রুধিরধারা ছুটিতেছে। কৃতান্ততুল্য দুরন্ত সৈনিক বেত্রদণ্ড উত্তোলিত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। রমণীর কি অপরাধ তিনি জানেন না, তথাপি নারীর প্রতি এ-পৈশাচিক অত্যাচার তাঁহার সহ্য হইল না। তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিয়া বজ্র-কঠোরস্বরে কহিলেন,—"খবরদার! পুনরায় যদি তোমার হস্ত উত্তোলিত কর, সে আঘাত রমণীর দেহ স্পর্শ

করিবার পূর্ব্বে তোমার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিবে।

আঘাতকারী উদ্যত-হস্ত অবনমিত করিয়া, সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক দ্বিতীয় একব্যক্তিকে কহিলেন,—"শীঘ্র রমণীর বন্ধন মোচন করিয়া দাও।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আগন্তুক রোষ-কষায়িতলোচনে তাহার দিকে চাহিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। সে-ব্যক্তি সভয়ে তাঁহার আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল। জাফর খাঁ এতক্ষণ নীরব ছিলেন। সহসা কে যেন তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছিল। এক্ষণে পুনরায় বাক্‌শক্তি পাইয়া কহিলেন,—"কাসিম আলি! তুমি জান আমিও নবাবের একজন সেনানী, তুমি আমার কর্ত্তব্য-কার্য্যে বাধা দিয়া প্রকারান্তরে নবাবেরই অপমান করিতেছ।"

আগন্তুক কাসিম আলিই বটে। তিনি নিজামের দরবার হইতে সদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। জাফর খাঁর উক্তিতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"ওঃ তাহা হইলে এই বর্ব্বতার তুমিই অনুষ্ঠাতা! এই পৈশাচিক কর্ম্মের তুমিই নেতা! ধিক তোমাকে!"

ইত্যবসরে তাঁহার সহচরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাঁহার ইঙ্গিতে একব্যক্তি জয়ন্তীর বন্ধন মোচন করিয়া দিল। জয়ন্তী আকাশের দিকে দক্ষিণহস্ত উত্তোলিত করিয়া কহিলেন,—"সদাশয় যুবক! ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন। আমি এতদিনে জানিলাম, মুসলমানের মধ্যেও দেবতা আছে।"

জাফর সাহেব কাসিমের তিরস্কারে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে কহিলেন,—"শীঘ্র ঐ-শয়তানীকে ঐ-প্রজ্বলিত অনলমধ্যে নিক্ষেপ কর! উহাকে জীবন্ত দগ্ধ কর।"

কাসিম আলি কহিলেন,—"নিরস্ত হও! জাফর সাহেব! তোমার নির্ম্মম-আদেশের প্রত্যেক বেত্রাঘাত রক্তাক্ষরে তোমার বর্ব্বতার জলন্ত-চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে! নারী-নির্যাতন করিয়া আর কাপুরুষতার পরিচয় দিও না। আমি আমার শেষ রক্তবিন্দুটুকু অবধি ব্যয় করিয়া এই রমণীকে রক্ষা করিব। সামর্থ্য থাকে অসিহস্তে আমার সম্মুখীন হও!"

জাফর। অর্ব্বাচীন বালক! কেন আপন মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছ? আমার কার্য্যে কেন বাধা দিতেছ? জান এ-রমণী কে? ইহার অপরাধ কি?

কাসিম। কিছুই জানিবার আবশ্যক নাই। এইমাত্র জানি এ রমণী—নারীমাত্রেই আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্রী।

জাফর। এ দস্যুবালা। ইহার পিতা সেই বিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দার মাধবগিরি। শয়তানী কোনরূপেই তাহার পিতার সংবাদ দিবে না, সেইজন্য আমি এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি!

কাসিম। জাফর সাহেব! আমি মাধবগিরির ইতিহাস সম্প্রতি অবগত হইয়াছি! মাধবগিরি একজন শান্তপ্রকৃতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিল, বলিতে পার কোন্ পিশাচের অত্যাচারের ফলে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট গৃহশূন্য হইয়া দস্যুদলে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল? কে তাহার রূপসী কন্যাকে তাহার কুটীরের শান্তিময় কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, নবাবের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছিল? কে তাহার সাধ্বী স্ত্রীর অকালমৃত্যুর কারণ? কোন্ পাষণ্ড তাহার একমাত্র পুত্রকে শৃগালকুক্কুরের ন্যায় নিগৃহীত করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল?

জাফর খাঁ ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত

হইয়া উঠিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারি ধরিয়া অৰ্দ্ধ-নিষ্কোষিত করিলেন কিন্তু কি ভাবিয়া, তাহা যথাস্থানে সংস্থাপনপূৰ্ব্বক, অপেক্ষাকৃত সংযতস্বরে কহিলেন,—"ইহার আরও অপরাধ আছে—এ-রমণী পিশাচিনী, দস্যুবৃত্তি ইহার ব্যবসা। যখন আমরা বেতনোর দুর্গ বিশ্বাসঘাতক সুজা আলির নিকট হইতে পুনরধিকৃত করিয়া লই, এই রমণীর সহায়তা বলেই সুজা আলি এবং দুর্গস্থ ইংরাজ সেনাপতি পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। এই পাপিষ্ঠার উত্তেজনাতেই দস্যু-কর্ত্তৃক আমাদের অনেকসৈন্য ধরাশায়ী হয়। ইহার সে-সকল অপরাধ কখনই উপেক্ষণীয় নয়।"

কাসিম। সেই রণক্ষেত্রে এই রমণী যেরূপ সাহসিকতা এবং অপূৰ্ব্ব-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার জন্যই ইঁনি বীরমাত্রেরই ভক্তির পাত্রী। তোমার হৃদয় দারুণ-নীচতায় পূর্ণ, তাই তুমি নিতান্ত অসহায়-অবস্থায় ইঁহাকে বন্দিনী করিয়া, এইরূপ নরাধমতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছ। তুমি ইঁহার প্রতি আর অত্যাচার করিতে পারিবে না।

জাফর। তুমি ন্যায়-বিচারের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছ।

কাসিম। ইহার নাম যদি ন্যায়-বিচার, তবে এরূপ বিচার জাহান্নমে যাউক। আমি রাজবিধির বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন করিতে চাহি না কিন্তু এরূপ অন্যায়-কার্য্যের চিরবিরোধী। তোমার হৃদয়ে যদি মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিত, তুমি কখনই এমন কোমলাঙ্গী রমণীর প্রতি এরূপ কঠোর-বিধানের পক্ষ সমর্থন করিতে না। তোমার সহিত অধিক বাকবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, তুমি এ স্থান হইতে দূর হও!

জাফর। নবাব-দরবারে তোমাকে তোমার এই দুর্ব্বিনীত-ব্যবহারের জবাবদিহি করিতে হইবে।

কাসিম। কাসিম আলি তাহার জন্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

জাফর খাঁ এই তেজস্বী যুবকের আর অধিক বিরক্তি উৎপাদন করিতে সাহসী হইলেন না। ভীরুতা বা নীচাশয়তা চিরদিনই সৎসাহসের পদতলে মস্তক অবনত করিয়া আসিতেছে। জাফর সাহেব যে ভীরু এবং নীচাশয়,—তাহার প্রত্যেক কার্য্যই তাহার পরিচয় দিয়া আসিতেছে। তিনি অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া লগুড়াহত সারমেয়ের মত বিশুষ্কমুখে সে-স্থান ত্যাগ করিলেন।

কাসিম আলি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং অনুচরবর্গকে দূরে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিয়া, শোণিতাপ্লুতা জয়ন্তীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! জয়ন্তী সহাস্যমুখে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন,—"মহাত্মন্! আপনি আমাকে রক্ষা করিয়া কি ভালকাজ করিলেন? আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-নারীর জীবন রক্ষা করিতে গিয়া আপনি আপনার জীবন বিপন্ন করিলেন মাত্র।"

কাসিম। তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত নহি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, জাফর সাহেব কখনই আমার নামে অভিযোগ করিতে সাহসী হইবে না। আর যদি করে, আমি অবনত মস্তকে রাজদণ্ড বক্ষ পাতিয়া লইয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিব। আমার বিবেক-বুদ্ধি যে-কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আমি তাহার গতিরোধ করিবার জন্য চিরদিনই ধাবমান হই।

জয়ন্তী। বিপন্নের যিনি সহায়, ভগবান তাঁহাকে সাহায্য করেন।

কাসিম। আমি না আসিলে পাষণ্ডেরা আপনাকে হত্যা করিয়া ঐ-অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত। কি জঘন্য প্রতিহিংসা! অপর

দিকে আপনার সাহস এবং সহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয়! মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা দেখিয়াও, আপনার ললাটের একটী শিরাও স্পন্দিত হয় নাই। আশ্চর্য্য বটে!

জয়ন্তী। জননী-জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া কে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে? মৃত্যু যখন অবধার্য্য, তখন হাস্যমুখে তাহাকে বরণ করাই কর্ত্তব্য!

কাসিম। সত্য। এ সব কথা যোদ্ধার মুখেই শোভা পায়। কোমলাঙ্গী নারী, অন্তঃপুরের শীতল ছায়ায় যাহাদের বাস, বিপদের ছায়া দর্শনেও যাঁহারা মূর্চ্ছিতা হন, তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ মৃত্যুর এমন কঠোর-মূর্ত্তি দেখিয়াও শঙ্কিতা হন না, আমার এ-ধারণা ছিল না। আপনি এখন কোথায় যাইবেন?

জয়ন্তী। আমি সন্ন্যাসিনী—আমার স্থানাস্থান নাই। যেদিকে চক্ষু যাইবে—যাইব।

কাসিম। আপনার পিতার নিকট যাইবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি যান, আমি স্বয়ং আপনাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিব।

জয়ন্তী। যদি যাই—একাই যাইব, পথপ্রদর্শকের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না।

কাসিম। পুনরায় শত্রুহস্তে পড়িতে পারেন।

জয়ন্তী। আমি ধ্যানস্থা ছিলাম—সজাগ বা হাতে ত্রিশূল থাকিলে জাফর খাঁ বা তাহার সহচরগণ আমার অঙ্গস্পর্শ করিতেও সমর্থ হইত না।

কাসিম। আপনার ত্রিশূল কোথায়?

জয়ন্তী। পর্ব্বতের উপর পড়িয়া আছে। তাহারা অতর্কিতভাবে

আমায় বন্দিনী করিয়া আনিয়াছে। আমি যাইবার সময় আমার ত্রিশূল এবং কমণ্ডলু লইয়া যাইব।

কাসিম। আপনার সহোদর যোগানন্দ কোথায়? আপনার পিতার নিকট?

জয়ন্তী। না।

কাসিম। কোথায় বলিতে আপত্তি আছে কি?

জয়ন্তী। বিশেষ কোন আপত্তি নাই—তিনি ইংরাজ-শিবিরে, তবে কোথায় বলিতে পারি না।

কাসিম। ইংরাজ-শিবিরে কেন?

জয়ন্তী। জাফর খাঁর রক্তে তর্পণ করিবার জন্য।

কাসিম। বুঝিতে পারিলাম না।

জয়ন্তী। নবাবের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে, রণক্ষেত্রে তিনি স্বহস্তে জাফর খাঁকে নিহত করিবেন।

কাসিম। আপনার পিতাও কি সদলে ঐ-কার্য্যে সহায় হইবেন?

জয়ন্তী। নিশ্চয়।

কাসিম। আপনি অসঙ্কোচে এ-সকল তথ্য প্রকাশ করিতেছেন কেন?

জয়ন্তী। আমার জীবনরক্ষকের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য।

কাসিম। যদি তাহাই হয়, আমাকে সঙ্গে লইয়া পিতার আড্ডায় বা তাহার নিকট পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে চাহিলেন না কেন?

জয়ন্তী। তাঁহার সহিত অনেক জীবনের সম্বন্ধ। তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে বিপন্ন করিবার আমি কে?

কাসিম। আমায় কি অবিশ্বাস করেন?

জয়ন্তী। না কিন্তু আপনি রাজকর্ম্মচারী, মাধবগিরির গুপ্ত

বাসস্থান জ্ঞাত হইলে, আপনার বিবেকবুদ্ধি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে নিয়তই তাড়না করিবে, সুতরাং তাহা না জানাই ভাল।

কাসিম। আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি বড়ই বুদ্ধিমতী। মতি বিবিকে কি আপনার মনে পড়ে?

জয়ন্তীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। সোৎসুককণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোন্ মতি বিবি? যিনি নবাবের অন্তঃপুরে- —"

কাসিম। হাঁ—তাঁহার কথাই বলিতেছি।

জয়ন্তী। তিনি কোথায়? কেমন আছেন? আহা এমন হিতৈষিণী আর পাইব না!

কাসিম। ভাল আছেন। তিনি আমার দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়া। সম্প্রতি তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার মুখেই আপনাদের পারিবারিক দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত অবগত হই। আপনার জন্য এখনও তিনি দুঃখ করেন।

জয়ন্তী। ভগবান্ তাঁহাকে সুখী করুন।

কাসিম। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, একাকিনী কেমন করিয়া পর্ব্বতারোহণ করিবেন, তাহাই ভাবিতেছি। যেরূপভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন, অন্য কেহ হইলে, এতক্ষণ তাহার উত্থানশক্তি রহিত হইত।

জয়ন্তী। অবস্থাই মানবের প্রধান-শিক্ষক। একসময়ে বাড়ীর মধ্যেও একা থাকিতে ভয় হইত, এখন বন-জঙ্গল বা পাহাড়ের উপরও নিঃসঙ্গ পড়িয়া থাকিতে মনে কোন আশঙ্কারই সঞ্চার হয় না।

কাসিম। দৈহিক যাতনা, ক্ষুৎপিপাসা—এ-সকলে কি আপনি কাতর হন না?

জয়ন্তী। হই—তবে সাধারণের মত নয়। অভ্যাসের ফলে এ সকলকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছি! যতদূর পারিয়াছি, তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই কষ্ট হয়।

কাসিম। অভ্যাসের বলে কি ইন্দ্রিয় জয় করা যায়?

জয়ন্তী। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? তবে ইন্দ্রিয় বিজয় করা বড়ই কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি সমগ্র ধরণী জয় করিতে পারে, সে-ও ইন্দ্রিয়গণের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। পৃথ্বিজয় অপেক্ষাও ইন্দ্রিয়বর্গের পরাজয় দুরূহ কার্য্য। কামাদিরিপুকে যে যতখানি দমন করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে ততখানি মনুষ্যত্বের বিকাশ পায়।

সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া কাসিম জয়ন্তীর নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন এবং অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন।

জয়ন্তী ধীরে-ধীরে পর্ব্বতশিখরে পুনর্ব্বার আরোহণ করিলেন। তাঁহার ত্রিশূলাদি সেইস্থানেই পড়িয়াছিল, সে-সকল গ্রহণ করিয়া, জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে পর্ব্বত-পথ অস্পষ্ট। প্রহার-যাতনায় শরীর অবসন্ন—একস্থানে একটা পার্ব্বত্যলতা পদে জড়াইয়া গেল, তাহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টায় অসাবধানে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। শিলাখণ্ডে মস্তকে আঘাত লাগায়, সংজ্ঞা হারাইয়া সেইস্থানেই পড়িয়া রহিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

উপেক্ষিতা

কাসিম আলি আমেদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বত্র সাজ-সাজ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বীরহৃদয় রণোল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াছে। পদাতিক, অশ্বসাদী, গজারোহী সৈন্যগণ কাতারে-কাতারে ত হইয়া নগররক্ষার্থ যথাযথস্থানে পরিচালিত হইতেছে। দুর্গ-প্রাকারে মৃত্যুমুখ বড়-বড় কামান সকল সংস্থাপিত হইয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করিতেছে। খাঁ সাহেব বড়ই ব্যস্ত—তাঁহার আহারনিদ্রার অবকাশ নাই—অশ্বপৃষ্ঠে দিবারাত্র চতুর্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শত্রুবাহিনীর অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা অদ্য প্রাতঃকালে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

কাসিম আলি নগরে উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার ফল আশানুযায়ী না হইলেও, নিতান্ত মন্দ হয় নাই। নবাবের সহিত প্রায় একঘণ্টাকাল নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া, রাজ-প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, নবাব তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—"কাসিম আলি! রাজ্যের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। তোমার শৌর্য্য-বীর্য্যের উপর আমি অনেকটা নির্ভর করি। তোমার সুহৃদ খাঁ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, নগররক্ষার্থে সচেষ্ট হও।"

কাসিম অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—"রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য! মানুষের যাহা সাধ্য, তাহাতে কাসিম. আলি পশ্চাৎপদ হইবে না—তাহার শরীরে যতক্ষণ শেষ শোণিতবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে—কখনই অস্ত্রত্যাগ করিবে না। ইহার অধিক আশ্বাস দিতে অধীন অক্ষম।"

সহাস্যে নবাব সাহেব কহিলেন,—"তোমার উপযুক্ত উত্তরই হইয়াছে। আমিও ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার সকল সৈনিক এবং সেনাধ্যক্ষ যদি তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং রাজভক্ত হয়, আমি অনায়াসে শত্রুকে আমার রাজ্যের বাহিরে তাড়াইয়া দিয়া আসিতে সমর্থ হইব। যাও, তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ, ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া খাঁ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করগে।"

কাসিম আলি বিদায় হইলেন। তিনি যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন, জাফর খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করিতে সাহসী হন নাই। নীচপ্রকৃতি জাফর প্রকাশ্যে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া, গোপনে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের বহুবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাদার খাঁ পুনরায় তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য নিয়োজিত হইল।

কাসিমের প্রত্যাবর্ত্তনের পর দিবসত্রয় অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে খাঁ সাহেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। প্রত্যেক-কার্য্যে তাঁহার সাহায্যের আবশ্যক হইতেছে। শত্রু নিকটবর্ত্তী। নগর বাহিরে যে-সকল দুর্গ ছিল, একে-একে নবাবের হস্তচ্যুত হইয়াছে। সকল সৈন্য এক্ষণে আমেদাবাদের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। বহুদর্শী খাঁ সাহেব নগররক্ষার্থ যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে সকলের

বিশ্বাস শত্রু যতই প্রবল পরাক্রান্ত হউক না কেন, তাহাদের অবরোধ অনায়াসে প্রতিহত করা যাইতে পারিবে।

সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রমের পর, কাসিম আলি বিশ্রামার্থ তাঁহার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বাস নগরের একপ্রান্তে; দুর্গমধ্যে তাঁহার অবস্থানের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐস্থানে তিনি আহার এবং রাত্রে বিশ্রাম করেন। তাঁহার ক্ষুদ্র অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে একটী ছোট উদ্যান। উদ্যানে নানাবিধ ফুলের গাছ—মধ্যস্থলে এক পাষাণবেদিকা। কাসিম বিশ্রামার্থ সেই পাষাণতলে উপবেশন করিলেন। চারিপার্শ্বে প্রস্ফুটিত বিবিধ ফুলের সুবাস—মৃদুল-সমীরণ হিল্লোলে-হিল্লোলে বহিয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল। মাথার উপরে নীল-নভোতলে অগণ্য তারকার মধ্যে শশধর সমুদিত, তাঁহার সুধাস্রাবী রজতরশ্মিধারায় তাঁহার ক্ষুদ্র উপবন প্লাবিত হইয়া হাসিতেছিল। সেইসময়ে দূরবর্ত্তী আম্রকাননের মধ্য হইতে কোকিলবধূর বেদনাভরা কুহু-কুহু রবে ঘুমন্ত প্রকৃতি যেন সজাগ হইয়া উঠিল—পৃথিবীর উপর পতিত রজত-রশ্মি শুভ্র আবরণখানিও যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। আর কাঁপিল আমাদের যুবক কাসিম আলি তরুণ-তরল-হৃদয়। সংসারের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে এতদিন কি যেন চাপা ছিল, হাস্যময়ী, মুক্ত প্রকৃতির কোলে বসিয়া, অনেকদিনের পর আজ আবার একখানি মুখ তাঁহার মনে পড়িল। স্পন্দিত-বক্ষে, তন্দ্রাবিজড়িতচক্ষে সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ভাবিতে-ভাবিতে কাসিম আলি এক অননুভূতপূর্ব্ব-সুখপ্রবাহে ভাসিয়া চলিলেন। এইভাবে কতক্ষণ অবস্থিত ছিলেন, তাহা তাঁহার ঠিক স্মরণ হয় না। সহসা শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর কাহার অস্পষ্ট, মৃদুপদবিক্ষেপশব্দে তাঁহার বিস্ময়ের

অবধি রহিল না। সম্মুখে অনতিদূরে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী দণ্ডায়মান। চন্দ্রমার শুভ্ররশ্মিমালা সুন্দরীর বদনকমলের উপর পড়িয়া আরও উজ্জ্বল—আরও মধুর—আরও মনোরম হইয়া জ্বলিতেছিল। এ-মুখ, এ-প্রফুল্ল নীলেন্দীবরনয়ন—এ-ফুল্ল রক্তিমাধর আর একদিন যে তিনি দেখিয়াছিলেন। খাঁ সাহেবের সৌধ-প্রকোষ্ঠের মুক্ত বাতায়নপথে এ-মুখচন্দ্র আর একদিন সমুদিত হইয়া যে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

সুন্দরী তরল-জ্যোৎস্নার উপর জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিয়া, নিথর প্রকৃতিকে স্পন্দিত করিয়া, বীণানিক্কণবৎ কোমলকণ্ঠে কহিলেন,—"আপনার দাসী—আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী অভাগী ফুলকুমারী।"

কাসিম আলি অধীর হইয়া উঠিলেন। শশব্যস্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—"ফুলকুমারী! খাঁ সাহেবের দ্বিতীয়া পত্নী! আপনি এখানে কেন?"

ফুলকুমারী হৃদয়ে একটু ব্যথা পাইলেন। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিলেন না, হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া পুনরায় সহাস্যাধরে কহিলেন,—"খাঁ সাহেব আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি আপনার নিকট আশ্রয়লাভের আশায় আসিয়াছি। সুখী হইব বলিয়া আপনার চরণতলে আমার জীবন-যৌবন অর্পণ করিতে আসিয়াছি।"

কাসিম আলি স্তম্ভিত। তাঁহার তরুণ-হৃদয়ে প্লাবন উপস্থিত হইল। কৌমুদী-প্লাবিত, কুসুমগন্ধ-সুবাসিত নির্জ্জন উদ্যানমধ্যে ফুল্লারবিন্দমুখী অযাচিতা তরুণীর প্রেমে কয়জন উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়? রূপসীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া হৃদয়মধ্যে স্থাপন

করিবার জন্য তাঁহার অন্তর অধীর হইয়া উঠিল। তিনি ভুজদণ্ড প্রসারিত করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সন্ন্যাসিনীর কথা মনে পড়িল—তাঁহার উপদেশাবলী বিজলী-বিকাশের মত মোহ-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে প্রকাশ পাইল। কথায়-কথায় জয়ন্তী বলিয়াছিলেন, "কামাদি রিপুকে যে যতখানি জয় করিতে পারে, তাহার মধ্যে ততখানি মনুষ্যত্বের বিকাশ পায়।"

কাসিম আলি দুই-তিনপদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখে মুখে একটা ভয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইল।

ফুলকুমারী মৃণালদণ্ডসন্নিভ ভুজদণ্ড উত্তোলিত করিয়া অশ্রুপ্লাবিত-নয়নে কহিলেন,—"কাসিম! কাসিম! প্রিয়তম! সরিয়া যাইও না। আমি তোমারই আশায় জীবন রাখিয়াছি। আমি জন্মদুঃখিনী—আমাকে সুখী কর! আমার রূপ আছে—যৌবন আছে—অন্তরে প্রেম আছে—আমিও তোমায় সুখী করিব! কেন তুমি সঙ্কুচিত হইতেছ? বৃদ্ধকে তোমার ভয় কিসের? সে আমার সম্পূর্ণ অযোগ্য! আমি আমার হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া তোমার সেবা করিব—তোমার চরণে কুশাগ্রের আঘাত লাগিলেও আমি ব্যথা পাইব। এস-এস সুন্দর! এস নয়নাভিরাম! আমার লালসা-বিক্ষুব্ধ উত্তপ্ত হৃদয়ে এস! তুমি সংসারে যে-সুখের আকাঙ্ক্ষা কর—আমি তাহাই দিব।"

কাসিম দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—"তুমি অপরের বিবাহিতা পত্নী, তোমার স্বামী এখনও বর্ত্তমান! আমি পর-পুরুষ, আমার নিকট তোমার এরূপভাবে এ-নির্জ্জননিশীথে আসা ভাল হয় নাই! আমি তোমার অভিলাষ পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বলহৃদয়, আমি করযোড়ে বিনীতকণ্ঠে বলিতেছি,—তুমি শীঘ্র এ-স্থান ত্যাগ কর, আমার সর্ব্বনাশ করিও না।"

ফুলকুমারী একটু আশা পাইলেন। সবেগে তাঁহার পদতলে পড়িয়া, বাহুলতাদ্বারা তাঁহার যুগলচরণ আবদ্ধ করিয়া কাতরতার সহিত কহিলেন,—"নির্দ্দয়! রমণী হত্যা করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিও না, আমি একান্তই তোমার! সেইদিন গবাক্ষে দাঁড়াইয়া তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি উন্মাদিনী হইয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার তরুণ হৃদয় মরুময় করিও না—তোমায় না পাইলে আমি আত্মঘাতিনী হইব।"

ফুলকুমারীর ব্যাকুলতার সঙ্গে-সঙ্গে কাসিমের হৃদয়ের দৃঢ়তাও বাড়িতে লাগিল। লোকে কাল-ভুজঙ্গিনীকে যেমন দূরে নিক্ষেপ করে, তিনিও সেইভাবে তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন,—"তুমি যতই রূপসী হও—তুমি কুলটা! কাসিম আলি কুলটার প্রণয়ের জন্য লালায়িত নহে। সম্প্রতি আমার হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটিয়াছে—আমি নারীজাতিকে কেবলমাত্র লালসাতৃপ্তির উপকরণ মাত্র মনে করি না। তুমি এখান হইতে দূর হও!"

পদাহতা ফুলকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুচ্ছবিমর্দ্দিতা ফণিনী যেমন করিয়া ফণা ধরিয়া দাঁড়ায়, তেমনই করিয়া দাঁড়াইলেন। রোষে এবং অন্তর্নিহিত বিষে ভুজঙ্গীর সর্ব্বশরীর যেমন জ্বলিতে থাকে—সর্ব্বাঙ্গ যেমন ফুলিতে থাকে, দংশন করিবার জন্য তাহার উদ্যত-ফণা যেমন সম্মুখে, পশ্চাতে দুলিতে থাকে, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে যেমন হলাহল উদ্গীর্ণ করিতে থাকে, ফুলকুমারীর দশাও ঠিক সেইরূপ হইল। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কলেবর যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া দশগুণ হইল, শিথিল কবরী-মস্তক হেলিতে দুলিতে লাগিল, নাসারন্ধ্র দিয়া মুহুর্মুহু প্রবলানিশ্বাস বহিতে লাগিল।

উপেক্ষিতা দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া, কালফণীর ন্যায় গর্জ্জন

করিয়া কহিলেন,—"কাসিম আলি! উপেক্ষিতা নারী আর দলিতা ফণিনী, উভয়ই সমান। আমি তোমায় এমন দংশন করিব, যাহার জ্বালায় তোমায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে হইবে! মূঢ় যুবক! এ অর্ব্বাচীনতার ফল হাতে-হাতে পাইবে। আজ হইতে তোমার অদৃষ্ট-আকাশে আমি দুষ্ট-গ্রহের মত উদিত হইলাম! সাবধান!"

ফুলকুমারী আর তথায় তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিলেন না। বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার রূপগর্ব্ব আজ চূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার ধারণা ছিল, পুরুষমাত্রেই তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে—যাহার উপর তাঁহার অনুগ্রহ বর্ষিত হইবে, সে হাতে স্বর্গ পাইবে। সে-ধারণার মূলে আজি কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। উল্কা পিণ্ডের মত জ্বলিতে-জ্বলিতে ছুটিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কাসিম আশ্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ফুলকুমারীর প্রতি তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। রমণী—যাহার এত সৌন্দর্য্য এত কোমলতা, তাহার হৃদয় এত অসার! কাসিম অবসন্নহৃদয়ে বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সত্যই ইন্দ্রিয়নিবহের মত কঠিন পদার্থ জগতে আর নাই।

চাঁপার মুখে কাসিমের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া, মুখারবিন্দ-বদনা ফুলকুমারী, মনোহর বেশ ধরিয়া, আয়তলোচনে কজ্জলরেখা টানিয়া, চাঁপার সহিত প্রেমাভিসারে আসিয়াছিলেন। তিনি উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন, চাঁপা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল।

আরও একব্যক্তি কাসিমের অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। তাঁহাকে উদ্যানমধ্যে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে ভাবিতেছিল, এমনসময়ে দুইটী রমণীকে অদূরে

সন্দিগ্ধভাবে আসিতে দেখিয়া, সে বৃক্ষচ্ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল, অপরা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল দেখিয়া, সে-ব্যক্তি তরুচ্ছায়া হইতে বাহির হইয়া, উক্ত রমণীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। এ রমণী তাঁহার পরিচিত কিন্তু তাহার সহিত সে-সময়ে কোনরূপ বাক্যালাপ না করিয়া, দ্রুতপদে প্রভুকে সংবাদ দিতে গেল। এ ব্যক্তি যে জাফর খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য মাদার খাঁ পাঠক বোধ হয়, তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছেন।

প্রভু ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। এতদিন পরে কাসিমের সর্ব্বনাশ সাধনের একটা সূত্র তাঁহার হস্তগত হইল। উদ্যানমধ্যবর্ত্তিনী রমণী যে, খাঁ সাহেবের কোন পত্নী, জাফর খাঁর অনুমান করিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমতঃ মনে করিলেন, খাঁ সাহেবকে সংবাদ দিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া, সকল বিষয় দেখাইয়া দিবেন কিন্তু পরক্ষণে কি ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন এবং ভৃত্যকে পশ্চাৎ আসিতে ইঙ্গিত করিয়া ঘটনাস্থলের অভিমুখে চলিলেন।

প্রেম-প্রত্যাখ্যিতা ফুলকুমারী উন্মাদিনীবৎ রাস্তায় বাহির হইবামাত্র জাফর খাঁর সম্মুখে পড়িলেন। পথে তখন অন্য কেহ ছিল না, বিশেষতঃ সে পল্লীটা কিছু বিরলবসতি, সুতরাং জাফর খাঁর সুবিধাই হইল। তিনি রমণীর গতিরোধ করিয়া সহাস্যে কহিলেন,—খাঁ সাহেবের পত্নীর নির্জ্জন নিশিথে এরূপ প্রেমাভিসার মন্দ নয়! সুন্দরী কি কাসিম আলির উপর অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন?"

ফুলকুমারী স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপভাবে একজন

অপরিচিত কর্তৃক সম্বোধিত হইয়া, তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। যুক্তকরে কহিলেন,—"আপনি যেই হউন, আমাকে রক্ষা করুন! আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না, আমি কোন মন্দ-অভিপ্রায়ে বাটীর বাহির হই নাই।"

হাসিয়া জাফর সাহেব কহিলেন,—"অভিপ্রায় আগাগোড়াই ভাল! কাসিম আলি সুন্দর-যুবক—তুমিও যুবতী, অসামান্যা-রূপসী! রাত্রিকালে একাকিনী তাহার সহিত সাক্ষাতে দোষ আর কি! সুন্দরি! আমার নাম জাফর খাঁ—আমিও একজন সেনানায়ক, তবে কাসিম আলির মত যুবক নহি—তুমি বোধ হয় এরূপ লোককে অনুগ্রহ কর না।"

যুবতী ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"রাজপথে দাঁড়াইয়া আলাপ করা নিরাপদ নয়, এখনই কোন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে বিপদ ঘটিবে।"

ইঙ্গিত পাইয়া জাফর সাহেব কহিলেন,—"উত্তম কথা। অদূরে একটা ভগ্নমন্দির আছে, সেইস্থানে এস,‍ কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে।"

ফুলকুমারী তাহাতেই সম্মত হইলেন। দেখিলেন কাসিম আলির মত নিরেট মূর্খ সকলেই নহে—সংসারে বুদ্ধিমান লোকও আছে। তিনি বুদ্ধিমান লোকটীর অনুগামিনী হইলেন। চাঁপা দূর হইতে এই সকল বিষয় দেখিয়া, অধিক গোলযোগের ভয়ে সরিয়া পড়িল।

ভগ্নমন্দিরে উপস্থিত হইয়া ফুলকুমারী কহিলেন,—"আমি বড়ই বিপন্না—আপনি কি আমাকে সাহায্য করিবেন?"

জাফর। আমি সুন্দরীমাত্রকেই, সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ফুলকু। আমি আপনার নাম শুনিয়াছি, আপনার শৌর্য্যবীর্য্যাদির কথাও শুনিয়াছি, আপনি কি আমাকে দয়া করিবেন?

জাফর। সুন্দরি! আমিই যে দয়ার ভিখারী। আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ কর।

ফুলকু। তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি কাসিম আলির হিতৈষী নও!

জাফর। নিশ্চয় না। আমার অমন শত্রু আর দুইটী নাই।

ফুলকু। সে আমারও পরম দুষমন্।

জাফর। তোমার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? তুমি কি তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নও?

ফুলকু। অহির সঙ্গে নকুলের যে সম্বন্ধ, তাহার সহিত আমারও সেই সম্বন্ধ।

জাফর। সে কি তোমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে?

ফুলকু। হাঁ।

জাফর। প্রত্যাখ্যিতা নারী কালফণীসদৃশা—তুমি তাহাকে দংশন করিতে চাও?

ফুলকু। তাহার রক্তদর্শন করিতে চাই। যে আমাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবে, আমি সর্ব্বস্ব বিকাইয়া তাহার ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব।

জাফর। সুন্দরি! তোমার অধরের একবিন্দু সুধার বিনিময়ে আমি শয়তানের দাসত্ব করিতে পারি। কিন্তু তুমি কি আর খাঁ সাহেবের নিকট প্রত্যাগমন করিবে না?

ফুলকু। না—তিনি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জাফর কহিলেন,—"খাঁ সাহেব বা কাসিম আলি, উভয়েই শক্তিশালী রাজকর্ম্মচারী, প্রকাশ্যে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইব না। কৌশলে এমন

কার্য্য করিব, যাহাতে উভয়েই হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইবে, দুইজনেরই উন্নতমস্তক অবনত হইয়া পড়িবে—উভয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ জন্মিবে কিন্তু তাহাতে তোমারও সাহায্যের আবশ্যক।

ফুলকুমারী সম্মত হইলেন, তখন দুইজনে সেই ভগ্নমন্দিরের ইষ্টকস্তূপের উপর পাশাপাশি বসিয়া সংকল্পসিদ্ধির পরামর্শ আঁটিতে বসিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর তাঁহারা একটী মীমাংসায় উপনীত হইলেন। সে-মীমাংসার ফল পাঠক যথাসময়ে অবগত হইবেন।

রাত্রি যখন প্রায় প্রভাত, দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া ভগ্ন-মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। ফুলকুমারী আর পিতৃভবনেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। জাফর খাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাধু-সঙ্গে

জয়ন্তী ধীরে-ধীরে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি এক পর্ব্বতগুহায় শায়িত। গুহাটী অনতিপ্রশস্ত, ঈষদালোকিত। প্রকৃতি-নির্ম্মিত সেই পাষাণময়কক্ষের তৃণশয্যার উপর তিনি শুইয়া আছেন। তিনি এখানে কেন? ভাবিতে-ভাবিতে বিগত দুর্ঘটনা একে-একে তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। শরীর এখনও অবসন্ন, অত্যন্ত দুর্ব্বল, কষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তাঁহার বেশ স্মরণ হইল, পর্ব্বত হইতে অবরোহণকালে, পড়িয়া গিয়া সম্ভবতঃ সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন। তাহার পর আর কোন ঘটনা তাঁহার মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি এ-স্থানে কেমন করিয়া আসিলেন? কে তাঁহাকে এ গিরিকন্দরে লইয়া আসিল? তৃণশয্যা রচিত করিয়া কে তাঁহাকে এখানে শায়িত করিয়া দিল? সহসা ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন, ক্ষতের উপর পত্র এবং বল্কল দিয়া কি বাঁধা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ঔষধ। পৃষ্ঠদেশে হস্তাবর্ত্তন করিলেন,—সেখানেও ঐ ব্যবস্থা। প্রহার-বেদনাও যেন অনেকটা মন্দীভূত বলিয়া বোধ হইল! কে তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে?

এতক্ষণ গুহাদ্বারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। তৃণশয্যা হইতে উঠিয়া দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে গৃহটীর অবস্থা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে গিয়া, তাঁহার দৃষ্টি দ্বারের উপর পড়িল। বিস্ময়-পুলকে তাঁহার সর্ব্বাবয়ব রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! অবাঙ্মুখে পলকহীন দৃষ্টিতে দ্বারদেশের দিকে চাহিয়া রহিলেন! গুহায় প্রবেশ-পথের উপর পদ্মাসনে এক পরম পুরুষ ধ্যানস্থ! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কি সৌম্য, শান্ত, সুন্দর আকৃতি! কি তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ গৌরকান্তি! বিস্তৃত-ললাট, সুগন্ধ-চন্দনলিপ্ত—শিরে শুভ্র-জটাভার—মুখে আবক্ষ-বিলম্বিত শ্বেত-শ্মশ্রুরাজি—নয়নপদ্ম নিমীলিত,, পরিধানে রক্তাম্বর। জয়ন্তী ধীরে-ধীরে নিঃশব্দে পার্শ্ব ফিরিয়া, যোগীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন, তাহার পর আভূমি ললাটস্পর্শ করিয়া, মহাপুরুষকে প্রণামপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। সভয় ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল—গণ্ড বহিয়া দর-দর ধারে

প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার যেন স্বতই মনে হইতে লাগিল, ইনিই সেই মহাপুরুষ!

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সাধুপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র অশ্রুপ্লাবিতা, বদ্ধাঞ্জলি, নতজানু জয়ন্তীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। অমনি জয়ন্তী পুনরায় ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। সাধু সুমিষ্টকণ্ঠে কহিলেন,—"উঠ বৎসে!"

জয়ন্তী উঠিয়া তাঁহার চরণতলে পুনরায় প্রণত হইয়া কহিলেন,—"প্রভু! আমার উপর সদয় হউন! গুরুদেব! আমাকে সৎপথে পরিচালিত করুন। আমি মহাপাতকিনী।"

সাধুপুরুষ সহাস্যে কহিলেন,—"মা! স্থির হও! এখন তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল, স্থিরভাবে আরও দুই-একদিন বিশ্রামের পর, তোমার দেহ সবল হইলে, আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করিব। তুমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে, আজ তিনদিনের পর তোমার জ্ঞান হইয়াছে।"

জয়ন্তী। তিনদিনের পর!

সাধু। হাঁ তিনদিনের পর। আমি তোমাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় এখানে লইয়া আসি, আমার প্রদত্ত-ঔষধের গুণে তুমি এই দিবস-ত্রয় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলে। এখন বোধ হয় অনেকটা সুস্থ হইয়াছ?

জয়ন্তী। দুর্ব্বলতা ভিন্ন এখন আমার আর কোন অসুখ নাই।

সাধু। ঐ-দেখ ঐ-স্থানে ফলমূলাদি এবং কমণ্ডলুতে পানীয় আছে, আহার কর। আহারান্তে পুনরায় বিশ্রাম কর, আমি কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে চলিলাম, অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। এ-স্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ, কোন আশঙ্কা নাই।

এই বলিয়া সাধুপুরুষ গাত্রোত্থান করিলেন! জয়ন্তী নির্দ্দিষ্টস্থানে

উপস্থিত হইয়া আহরিত ফলমূল এবং সুশীতল পানীয়ের দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসার শান্তি করিয়া শয়ন করিলেন এবং অচিরকালমধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত—গুহাভ্যন্তরে নিবিড়ান্ধকার। তিনি ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিলেন—সে পার্ব্বত্যকক্ষে আর কেহ আছেন কিনা বুঝিতে পারিলেন না। সাধু কি আসিয়াছেন? যদিও আসিয়া থাকেন, হয়ত তিনি নিদ্রিত, তাঁহার বিশ্রামসুখে ব্যাঘাতোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নয় বিবেচনা করিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। এক-একবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অপর কাহারও নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। ক্রমশঃ সেই ধারণাই তাঁহার বদ্ধমূল হইল। নানাবিষয় ভাবিতে-ভাবিতে পুনরায় তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাত্রি শেষে মধুরকণ্ঠ স্তোত্রপাঠের শব্দে তাঁহার নিদ্রাবেশ দূরীভূত হইল। তিনিও শয্যার উপর কৃতোপবেশন হইয়া ভক্তিসহকারে মনে-মনে বিবিধ-স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ উষার আলোকচ্ছটা গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া, অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া দিল। সাধু গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, গুহার বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। জয়ন্তী তাঁহার নিকটস্থ হইলে কহিলেন,—"অদূরে ঝরণা আছে, হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া আইস।"

জয়ন্তী সাধুর চরণে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইলেন। অদ্য তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, সাধু পদ্মাসনে ঊর্দ্ধনেত্রে ভগবানের ধ্যান করিতেছেন। তিনি অদূরে উপবিষ্ট হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার সাধনা পরিসমাপ্তি হইলে, জয়ন্তীকে তাঁহার নিকটস্থ হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

জয়ন্তী নিকটে আসিয়া উপবেসন করিলে, সাধু কহিলেন,—"এখন কি করিবে মা? কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে?"

জয়ন্তী। আপনিই এখন আমার পথের প্রদর্শক—যে-পথ, নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই আমার অবলম্বনীয়।

সাধু। তুমি নারী—তোমার পিতা ভ্রাতা যে পথে চলিতেছেন, তোমার তাহা পরিত্যজ্য। প্রতিহিংসা নরের ধর্ম্ম হইতে পারে, নারীর নয়। রাগ, দ্বেষ, হিংসা চিরদিনই ধর্ম্মপথের পরিপন্থী।

জয়ন্তী। কি করিলে এ-সকল বৃত্তি দমন করা যায়?

সাধু। ক্ষমার পরিচালনা দ্বারা। যাহার দেহে এইগুণের যতখানি উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে, সে ততখানি সুখী। ক্রোধাদি রিপু যাহার হৃদয়ে যত প্রবল, তাহার দুঃখের কারণ তত অধিক।

জয়ন্তী। কি করিলে শান্তি পাওয়া যায়? সংসারে পদে পদে এত অশান্তি কেন?

সাধু। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি অতি বিরল। জগতে সুখী হইতে অসাধ কাহার? উদয়াস্ত প্রত্যেক মানব সুখের অন্বেষণে ঘুরিতেছে, কিন্তু সকলেরই কি সাধ পূর্ণ হয়? সর্ব্বত্যাগী হইয়া পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে শান্তি পাওয়া যায় না।

জয়ন্তী। তাহা হইলে সংসারীমাত্রেই কি অশান্তির দাস?

সাধু। সংসারে যাহার যতখানি আসক্তি—তাহার অশান্তির কারণও ততটা অধিক। সংসার-বন্ধনের নামই অশান্তি। ধর্ম্মচর্চ্চা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান শান্তির সোপান। সংসারে থাকিয়াও যিনি যতখানি পুণ্য-পথের পথিক, তিনি সেই পরিমাণে শান্তি-সুখের অধিকারী।

জয়ন্তী। ভগবান শান্তি-নিকেতন, তিনি করুণাময় কিন্তু তাহার রাজ্যে এত অনাচার, এত অশান্তি, এত দুঃখ-দুর্দ্দশা কেন?

সাধু। আমরা সামান্য বুদ্ধিতে যেটাকে দুঃখ, অশান্তি মনে করি, সেইটার মধ্যেই হয় ত পরম শান্তি এবং কল্যাণ নিহিত আছে। দুঃখ-যন্ত্রণা এবং অশান্তি অধিকাংশস্থলেই শান্তির জনক। অধিকাংশ স্থলে বলিবার উদ্দেশ্য, তাঁহার জটীল বিশ্বরহস্যের সকল নিগূঢ় রহস্য আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে সমাধান করিতে পারি না। লোকে বিপদে পড়িলে, তাহার দুঃখের অবধি থাকে না সত্য কিন্তু সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, মনে যে সুখের সঞ্চার হয়, যে কখনও বিপদে পড়ে নাই, সে কখনই সে সুখের অধিকারী হইতে পারে না। রাত্রির অন্ধকার আছে বলিয়াই দিবসের আলোক এত আনন্দদায়ক। অমাবস্যা হয় বলিয়াই পূর্ণিমার এত আদর। দুঃখ না থাকিলে সুখের উপলব্ধিই হইত না! চিরহিমানীর কোলে যাহার বাস, স্নিগ্ধ-সলিলপানে কি আনন্দ, সে কি কখনও অনুভব করিতে পারে?

জয়ন্তী। আমরা সামান্য মানব, এ-সকল বুঝিতে পারি কই? বিপদে পড়িলেই আত্মহারা হই—করুণাময়ের করুণায় সন্দেহ জন্মে—বিশ্বাসের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়ে।

সাধু। মুগ্ধ-জীবের স্বভাবই ঐ। মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সদাসৎ বুঝিতে পারে কই? সংসার-সুখে মগ্ন-জীব বিপদে না পড়িলে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। মূঢ়-মানব মনে করে ভগবান তাহার উপর বিরূপ বলিয়াই তাহার এত দুঃখ! কিন্তু ভগবানের অনন্ত করুণা যে তাহার উপর পতিত, তাহা সে বুঝিতে পারে না। ভগবান বরপ্রদ হইয়া কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইলে, পাণ্ডব-জননী চির-দুঃখের কামনা করিয়াছিলেন। সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত না হইলে, বক্ষঃপঞ্জর ভাঙ্গিয়া না পড়িলে,

সহজে কি তাঁহাকে মনে পড়ে? মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন জীবকে সজাগ করিয়া দিবার জন্যই, বিপদ বা অশান্তির আবির্ভাব হয়। যাহার ভাগ্য প্রসন্ন, সে সেই ডাকে জাগিয়া বসে, সংসারে সৎপথের পথিক হইয়া শেষে শান্তিময়ের কোলে আশ্রয়লাভ করে। যে নিতান্ত অভাগা, সে মুহূর্ত্তের জন্য পাশমোড়া দিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। ভগবান পুনঃপুনঃ তাহাকে জাগ্রত করিবার প্রয়াস পাইলেও, তাহার জ্ঞান হয় না।

জয়ন্তী। এ-মোহ-পাশ হইতে জীবের মুক্তিলাভের কি উপায় নাই?

সাধু। যেখানে বিপদ আছে, সেইখানেই বিপদুদ্ধারের উপায় আছে। সাধুসঙ্গ, পুণ্যানুষ্ঠান এবং ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিই মোহ-পাশ হইতে মুক্তিলাভের বিশিষ্ট উপায়। সংসারাসক্তি অনেকটা কাঁটাগাছের মত। কণ্টকী লতায় বস্ত্রাঞ্চল আবদ্ধ হইল, মানব তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যতই চেষ্টা পায়, কণ্টক-বন্ধে বসনাগ্র ততই জড়াইয়া ধরে। শেষে ক্ষতবিক্ষত দেহে বাহির হইয়া আইসে।

জয়ন্তী। এ-আসক্তিই যদি এত অশান্তির হেতু, এ-আসক্তি তিনি সৃষ্টি করিলেন কেন?

সাধু। এই আসক্তিই যে তাঁহার সৃষ্টি-রহস্যের মূল ভিত্তি। এ-বন্ধন না থাকিলে জগৎ থাকে কই! এই আসক্তিই জীবের চেতনা—ইহার তিরোভাবে একদিনেই জীব-জগৎ জড়ে পরিণত হইয়া যাইবে। সকল পদার্থেরই ভাল-মন্দ দুইটা দিক আছে। এই আসক্তিই নরকে নরকপথে পরিচালিত করে, আবার এই আসক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জীব শিবত্বলাভ করে। যাহার যে-দিকে মতি, সে সেইদিকে যায়।

জয়ন্তী। সংসারে যদি এত দুঃখ-যন্ত্রণা, এত অশান্তি, তবে সংসারাশ্রম সকল আশ্রমের সার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে কেন?

সাধু। তাহারও কারণ আছে,—ইহা যেমন সহজ, তেমনই কঠিন। সহজ এইজন্য, গৃহী অল্পায়াসেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। জীবে দয়া, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা এবং ভগবানে ভক্তি করিতে পারিলেই তাহার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। কঠিন এইজন্য, আত্মসুখরত জীব সহজেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, পরের প্রতি দয়া করিতে, কর্ত্তব্য পালন করিতে বা ভগবানকে ডাকিতেও অবসর পায় না। আসক্তির পঙ্কিলহ্রদে পড়িয়া যতই উঠিবার চেষ্টা করে, ততই সে কর্দ্দমে ডুবিতে থাকে। সংসারের শত প্রলোভন হইতে সরিয়া গিয়া, জনমানবশূন্য বিজন বিপিনে বা গিরিকন্দরে বসিয়া যে ভগবৎ চিন্তা করে, তাহার অপেক্ষা যে সংসারের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও, আসক্তির প্রসারিত পাশ হইতে আপনাকে বিমুক্ত রাখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে পারে, তাহারই কৃতিত্ব অধিক। এইজন্যই সংসারাশ্রমকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

জয়ন্তী। সাংসারিক সুখ অনিত্য কেন?

সাধু। কারণ তাহা স্থায়ী হয় না। আজ যাহাতে তোমার সুখানুভূতি হইতেছে, কাল তাহাই দুঃখের নিদান বলিয়া মনে হইবে। বালক যেমন কোন সুন্দর বস্তু দেখিলে, তাহার জন্য লালায়িত হয়, না পাইলে কাঁদিয়া পিতামাতাকে জ্বালাতন করে, পাইলেও কিন্তু তাহাতে অধিকক্ষণ সন্তুষ্ট থাকে না; আবার একটী কোন নূতন দ্রব্য দেখিলেই, তাহার প্রতি হস্তপ্রসারণ করে। সাধারণ নরনারীর স্বভাবও কি তাহাই নয়? তাহারাও কি কোন

একটী অভিনব দ্রব্য দেখিলে লালায়িত হয় না? আকাঙ্ক্ষার পর আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ইহার তৃপ্তিতে সুখ, অতৃপ্তিতে নিরানন্দ। আর নিত্যানন্দের ধ্যানে যে সুখ তাহা স্থায়ী, অনাবিল, অবিচ্ছিন্ন। সেইজন্যই জ্ঞানীপুরুষ অনিত্য সুখের মোহে মুগ্ধ না হইয়া, সংসারবিলাস ত্যাগ করিয়া, নিত্য সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

জয়ন্তী। ভগবৎ কৃপায় আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আপনার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া, আমার অনেক ভ্রমান্ধকার দূর হইবে। পিতার বা ভ্রাতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সংসারে আর লিপ্ত হইবার বাসনা নাই। আমি হিন্দু-বিধবা, ব্রহ্মচারিণীর ব্রত অবলম্বন করিলেও স্নেহমমতার প্রাবল্যহেতু সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি নাই। শেষে মুসলমানের অত্যাচারে গৃহচ্যুত হইলেও, উত্তেজনারবশে প্রতিহিংসা লইতে গিয়া অনেক অকার্য্য করিয়াছি।

সাধু। তজ্জন্য তোমার মনে যদি গ্লানি জন্মিয়া থাকে, সাধু-সঙ্গে এবং তীর্থভ্রমণে তাহা অপনোদিত হইবে। স্ত্রীজাতির অন্য ধর্ম্ম নাই—পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম্ম। সে-পতি জীবিত হউক আর মৃতই হউক তাহার চিন্তাই—তাহার পূজাই তাহার করণীয়। পতিদেবতার পূজা করিলেই বিশ্বপতির পূজা হয়। তুমি তোমার পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আইস, নীলগিরির উপর এক পরম রমণীয় স্থান আছে, সেইস্থলে ভবভয়হরা তারার এক মন্দির আছে, আপাততঃ সেই মঠে অবস্থান করিয়া যোগাভ্যাস করিবে। তাহার ফলে চিত্তের স্থিরতা জন্মিবে। চিত্তস্থির না হইলে কোন কার্য্যসিদ্ধ হয় না। বাতবিক্ষুব্ধ চঞ্চল সলিলে কোন কিছুর ছায়া সুস্পষ্ট বা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় না।

জয়ন্তী। আমি আজই যাত্রা করিব।

সাধু। না, অদ্য বেলা অধিক হইয়াছে, বিশেষতঃ তোমার দেহ এখনও তেমন সবল হয় নাই। কল্য প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রা করিও।

জয়ন্তী। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাইব।

সাধু। অদ্য হইতে একপক্ষ পরে এইস্থানেই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।

জয়ন্তী। গুরুদেব! যদি অপরাধ মার্জ্জনা করেন, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

সাধু ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—"তুমি মনের মধ্যে যে কথার আলোচনা করিতেছিলে, আমি কেমন করিয়া অবগত হইয়াছিলাম?"

জয়ন্তী আরও বিস্ময়াবিষ্টা হইলেন। আজও তিনি ঠিক ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিতেছিলেন। সাধু পুনরায় কহিলেন,— "চেষ্টা করিলে, তোমারও একদিন এ ক্ষমতা জন্মিবে। যে বিভূতিবলে পূর্ব্বতন যোগী ঋষিগণ ভূতভবিষ্যৎ নখদর্পণের মত দেখিতেন, সহস্রযোজন অন্তরে বসিয়াও অন্যস্থানের সংবাদ দিতে পারিতেন, এও সেই বিভূতির একটা অংশ মাত্র। হিন্দুর যোগবল অনন্ত শক্তির আধার—যোগবলে কত অঘটন ঘটিতে পারে। উহার পূর্ব্বে তোমাকে আরও অনেকবার দেখিয়াছিলাম, তখনও তোমার কর্ম্ম শেষ হয় নাই, তাই তোমায় দেখা দিই নাই।"

জয়ন্তী। আমার আবার কি কর্ম্ম প্রভু?

সাধু। কর্ম্মছাড়া কি জীব আছে? তুমি না থাকিলে মাধবগিরি কি অত সহজে লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন, না অমিততেজে বলীয়ান হইয়া, দুর্দ্ধর্ষ নবাব-সেনার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইতেন? তোমার উৎসাহে উৎসাহিত না হইলে, তোমার দৃষ্টান্তে পরিচালিত

না হইলে, তুমি ত্রিশূলকরে রণরঙ্গে উন্মত্ত না হইলে, সেদিন মুঞ্জা এবং ইংরাজ-সেনাপতি কি রক্ষা পাইত? রমণী যে শক্তিরূপিণী—শক্তির অংশে যে তাহার জন্ম। পাণ্ডবের যত বুদ্ধি, ভরসা, বল—সবই ত দ্রৌপদী। পাঞ্চালির প্রতিনিয়ত উত্তেজনার ফলেই ত পাণ্ডবের রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। জগতে শান্তিস্থাপনের জন্য, আশ্রিত দেবগণের রক্ষাবিধানার্থ স্বয়ং ভগবতী দানবদলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জয়ন্তী। তাহা হইলে সংসারে রক্তপাতেরও আবশ্যক হয়?

সাধু। হয় বৈ কি মা! এ-সংসার ভগবানের সাধের বাগান। গাছ পুঁতিলেই আগাছা জন্মায়,—কৃষক যত্ন করিয়া আগাছা তুলিয়া ফেলে। কোথাও গাছের ঘনসন্নিবেশে তাহার আওতায় ভাল-ভাল গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইলে, উদ্যানরক্ষক কি সমগ্র উদ্যানকে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি বৃক্ষ ছেদন করে না? সংসার বক্ষে পাপের প্রশ্রয় বাড়িলে, অনাচারীর দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে, তাহাদের বিনাশের আবশ্যক হয়। যখন অপরের দ্বারা সে কার্য্য সমাধা না হয়, তখন দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য, সাধুসজ্জনের রক্ষার জন্য ভবভয়হারী যুগে-যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

জয়ন্তী। এখন এইপর্য্যন্ত থাক, সন্ধ্যার পর অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করিব।

তখন উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন এবং পার্ব্বত্য ফলমূল আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কালসর্পীর বিষোদ্গীরণ

ইংরাজবাহিনী আসিয়া আমেদাবাদের দুইক্রোশ দূরে এক বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির উপর শিবির সন্নিবেশ করিল! এই বিরাট-বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন হার্ব্বাট স্বয়ং। তিনি এক্ষণে সুস্থ এবং সবলকায় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার শুভ্র প্রশান্ত ললাটে এবং নীলাভনয়নে সাহস এবং অধ্যবসায়ের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বালাপুর হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়া, পথে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া, অনশনে অনিদ্রায় ক্লান্ত হইয়া, পরিশেষে লালুর দুর্গে উপনীত হইয়াছিলেন। সেস্থানে কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করিয়া, পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করেন, তাহার পর মান্দ্রাজ হইতে নূতন সৈন্য আসিলে, নব-উদ্যমে উৎসাহিত হইয়া, আমেদাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন।

হার্ব্বাট সন্ধ্যার সময় শিবিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে এক যোদ্ধ,পুরুষ আসিয়া, অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সাহেব সহাস্যবদনে তাঁহাকে সম্মুখস্থ আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার পরিধানে খাকিবর্ণের কোট প্যাণ্ট কটীতটে দোদুল্যমান দীর্ঘ তরবারি, মস্তকে উষ্ণীষ, বক্ষে সামরিক সম্মান চিহ্ন। হার্ব্বাট আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"যোগানন্দ সংবাদ শুভ ত?"

যোগানন্দ কহিলেন,—"হাঁ, আমাদের আশানুরূপই কার্য্য হইবে।

ঠাকুরের সম্প্রদায় ইতিমধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা দুই একজন করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে, সাধারণ নাগরিকের মত নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইভাবে ন্যূনাধিক পাঁচশত যোদ্ধা নগরপ্রাকারের মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া সুসময়ের প্রতীক্ষা করিবে, অবশেষে আমাদের সঙ্কেত পাইলে, রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবে। ভিতর এবং বাহির হইতে আক্রান্ত হইয়া, নিশ্চয় নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে।"

হার্কাট। অস্ত্রশস্ত্র কিরূপভাবে সরবরাহ হইতেছে?

যোগানন্দ। ক্ষুদ্রতরবারি এবং পিস্তল, বস্ত্রের পেটিকার মধ্যে গিয়াছে, কতক বা রুদ্ধদ্বার শিবিকার সাহায্যে প্রেরিত হইতেছে।

হার্কাট। আমাদের পশ্চাদ্গামী পদাতিক সৈন্য কতক্ষণে আসিয়া পঁহুছিবে?

যোগানন্দ। যদি তাহারা রাত্রে কোথাও বিশ্রাম না করে, প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদিগকে দেখা যাইবে, নচেৎ বেলা দশটার কম তাহারা উপস্থিত হইতে পারিবে না।

তৎপরে নগর আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক আলোচনা হইল। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় যোগানন্দ উঠিয়া তাঁহার নিজ শিবিরে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন। তিনি এবার আর পথপ্রদর্শক বা সামান্য সৈনিক নহেন। একদল দেশীয় অশ্বারোহী সেনার পরিচালক। তাঁহারই কৃপায় হার্কাট স্বাধীনতা পাইয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার জীবনরক্ষা হইয়াছে। তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে সৈনিক বিভাগের একটা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এ-পদ যে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকে অর্পিত হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ সাহসে,

অধ্যবসায়ে এবং কৌশলে এ পদের অপর কোন ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অংশেই তিনি হীন নহেন। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং দেশাভিজ্ঞতার গুণেই হার্ব্বাট শত্রুর রাজ্য হইতে নিরাপদে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে হার্ব্বাটের অবশিষ্ট সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত দিবস বিশ্রাম করিয়া সবল হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত নীরব। তাহার পর সেনাপতির আদেশে সেনানীগণের ইঙ্গিতে সেই সমবেত সৈন্য ক্রমে-ক্রমে দক্ষিণে এবং বামে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বৃত্তাকারে বিস্তৃত সৈন্যের উভয় মুখ যখন একত্র হইল, তখন উষার আলোক-চ্ছটা সবেমাত্র পূর্ব্বাকাশের ললাটে তাহার আগমন চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল। এ-কার্য্য এত নীরবে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইল যে, বেলা একপ্রহর অতীত না হইলে, আমেদাবাদবাসী বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, তাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত দিবস এইভাবে অতিবাহিত হইল। নবাবসৈন্য নগরপ্রাকার হইতে বাহিরে প্রায় দুইক্রোশ অগ্রসর হইয়া নগর-শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল না কিংবা অবরোধকারীরাও আক্রমণের কোন চেষ্টাই করিলেন না।

রাত্রি প্রভাত হইলে নগরবাসীরা পুনরায় জানিতে পারিল, বিপক্ষসৈন্য নগর হইতে মাত্র একক্রোশ দূরে অবস্থিত। নগরের একদিকে এক ক্ষুদ্রনদী—অপর তিনদিকে প্রাকার। পূর্ব্বদিকে প্রধান দুর্গ, অপর তিনদিকে সামান্য কেল্লা মাত্র। প্রভাত হইবামাত্র দুর্গপ্রাকার হইতে নবাবের গোলন্দাজ সৈন্য

তোপ দাগিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজবাহিনী সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ উত্তোলিত করিয়া, তাহার অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিল। ইংরাজশিবির হইতেও মধ্যে-মধ্যে দুই-একটি কামান গর্জ্জিতে লাগিল। উভয়পক্ষই কেহ কাহাকে তেমন প্রবল-ভাবে আক্রমণ করিল না।

কাসিম আলি, জাফর খাঁ এবং খাঁ সাহেব সমস্ত দিন নগর মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া, সৈন্যদিগকে উৎসাহিত এবং নগরের নানা স্থানে কামানাদি সজ্জিত করিয়া, নগরটীকে সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া খাঁ সাহেব দুর্গমধ্যে বিশ্রাম করিতেছেন, এমনসময়ে একজন অপরিচিত লোক তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, কাসিম আলির সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে তাহার কি আবশ্যক। লোকটা ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"তাঁহার নামে একখানা পত্র আছে।"

খাঁ সাহেব। পত্র কে দিয়াছে?

লোক। একটি পরিচারিকা, আমার হাতে পত্রখানি দিয়া, কাসিম আলিকে দিতে অনুরোধ করিল।

খাঁ সাহেব। কৈ পত্র দেখি।

লোকটা সঙ্কুচিতভাবে কহিল,—"অপরের হাতে দিতে নিষেধ আছে।"

খাঁ সাহেবের কৌতূহল আরও বাড়িল। কহিলেন,—"আমার নিকট রাখিয়া যাও, কাসিম আসিলে তাহাকে দিব।"

লোকটা কি চিন্তা করিয়া, তাঁহার হাতে পত্রখানি দিয়া, কতকটা ত্রস্তভাবে প্রস্থান করিল। খাঁ সাহেব পত্রখানা বস্ত্রমধ্যে রাখিয়া

করিতে চায়! আমি তাহাদের সুখের পথের কণ্টক! আমাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিতে চায়!—বন্ধুহত্যা, প্রভুহত্যা, স্বামীহত্যা কোন মহাপাতকেই তাহাদের শঙ্কা নাই! এ-পাপের প্রশ্রয় কখনই দিব না—দুর্বৃত্তকে এবং শয়তানীকে আবক্ষ প্রোথিত করিয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব! দেখি কে তাহাদের রক্ষা করে! বাহিরে কে আছিস?"

একজন সশস্ত্র প্রহরী কুর্ণিস করিয়া সম্মুখে দাড়াইল। খাঁ সাহেব তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই কহিলেন, "শীঘ্র কাসিম আলিকে আমার নিকট ডাকিয়া আন!"

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে কাসিম আলিকে লইয়া উপস্থিত হইল। খাঁ সাহেবের ইঙ্গিত পাইয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল।

খাঁ সাহেবের আরক্তিম মুখমণ্ডল দেখিয়া কাসিম আলি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। খাঁ সাহেব তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন,—"যুবক! ফুলকুমারী কোথায়?"

কাসিম আলি আকাশ হইতে পড়িলেন। ফুলকুমারী কে? খাঁ সাহেবের পত্নীর নাম যে ফুলকুমারী, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার সম্বোধনে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া কহিলেন,—"ফুল-কুমারী কে?"

প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। তাঁহার কল্পিত-কপটতায় দ্বিগুণিত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"ভণ্ড যুবক! এখনও সাধুতার ভাণ? ফুলকুমারী কে জাননা? তোমার উপপত্নী—তোমার উপকারী বন্ধু খাঁ সাহেবের পত্নী!"

অন্ধকারের মধ্যে দপ্ করিয়া আলোক জ্বলিয়া, যেমন সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করে, খাঁ সাহেবের এই শেষোক্ত কথায় তেমনই

সেদিন রাত্রের সকল ঘটনা তাঁহার স্মরণ হইল। খাঁ সাহেবের সেই পত্নীর নাম যে ফুলকুমারী তাহা বুঝিতে পারিলেন। লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল। গলা ঝাড়িয়া কহিলেন,—"কেন তাঁহার কি হইয়াছে?"

হাত নাড়িয়া, মুখভঙ্গিমা করিয়া খাঁ সাহেব কহিলেন,—"কেন তাঁহার কি হইয়াছে? সাধুপুরুষ, সচ্চরিত্র যুবক কিছুই জানেন না। পাজি বদমায়েস! ফুলকুমারীকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিস—শীঘ্র বল, তোর অন্তিমসময় উপস্থিত! মনে ভাবিস না খাঁ সাহেবের পবিত্রকুলে কালিমা দিয়া, একলহমাও জীবিত থাকিবি!"

কাসিম আলি হতবুদ্ধি। খাঁ সাহেবের প্রত্যেক ভর্ৎসনা বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"অকারণ আমাকে লাঞ্ছিত করিতেছেন। আমি আপনার সকল কথার মর্ম্মবোধ করিতে পারিতেছি না। কি হইয়াছে আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন!"

ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া সেনাপতি কহিলেন,—"নির্লজ্জ যুবক! আমার যুবতী পত্নীর সর্ব্বনাশ করিয়া, তাহাকে কুলের বাহির করিয়া, তাহার কলঙ্কিত স্বামীর সম্মুখে কথা কহিতে এখনও তোমার সাহস হইতেছে? বলিহারি তোমার সাধুতার ভাণকে! বলিহারি তোমার সরলতাকে! তুমি কি এখনও বলিতে চাও, তুমি কোন দোষে দোষী নও? হতভাগ্য যুবক! তোমার পাপের জলন্ত নিদর্শন আমার হস্তগত হইয়াছে! এই দেখ—এই পত্রখানা পাঠ করিয় দেখ—তাহার পর পার যদি অস্বীকার করিও।"

এই বলিয়া খাঁ সাহেব পত্রখানা বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। কাসিম পত্র লইয়া প্রথমতঃ শিরোনাম পাঠ করিলেন

দেখিলেন পত্র তাঁহারই নামে প্রেরিত। পত্রের মধ্যে যাহা লেখা ছিল, পড়িতে-পড়িতে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—একবার অধরপাশে একটু হাসিও ফুটিয়া উঠিল। পত্রখানি ফুলকুমারী তাঁহাকে লিখিতেছে। তাহাতে লেখা ছিল :—

"প্রাণের কাসিম !

পত্রপাঠ করিয়া, পত্রবাহিকার সহিত আসিবে। আমি তোমার অদর্শনে অধীরা হইয়া, তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। যদি সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতেই না পাইব, তবে সে বৃদ্ধ বাঁদর খাঁ সাহেবকে ত্যাগ করিয়া আসিলাম কেন? সমস্তদিন সরকারী কাজে ব্যস্ত থাক, রাত্রেও কি একবার করিয়া আসিতে পার না? তুমিই ত প্রলোভন দেখাইয়া, দূতীর মারফৎ পত্রের উপর পত্র লিখিয়া, সর্ব্বদা আমাকে বুকে করিয়া রাখিবার আশ্বাস দিয়া কুলের বাহিরে আনিলে? দুইদিনেই কি তোমার পিপাসা মিটিয়া গেল? আমার আকাঙ্ক্ষার এখনও যে তৃপ্তি হয় নাই! তোমাকে একদণ্ড চোখে না দেখিলে আমি যে ভুবন অন্ধকার দেখি! সে বুড় বক্কেশ্বর এখন কোথায়? তাহাকে তোমার এত ভয় কেন? কৌশল করিয়া তাহার সরবতে একদিন সেই বিষের গুঁড়াটা মিশাইয়া দিয়া, কার্য্য শেষ করিয়া ফেল না! আপদ চুকিয়া গেলে, গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতে পাই। এমনভাবে আবদ্ধ হইয়া গোপনে কতদিন বাস করিব? এস বঁধু! এস হৃদয়বল্লভ! তোমার আদরের ফুলকুমারী তোমার জন্য ফুলের শয্যা রচনা করিয়া বসিয়া আছে। কাল অবধি আস নাই—তাই অধীর হইয়া পত্র লিখিলাম। না আসিলে তোমার ফুলকুমারী মরিবে ইতি—

"তোমার একান্ত অনুগতা ফুলকুমারী।"

পত্রপাঠ শেষ হইল। ব্যঙ্গস্বরে খাঁ সাহেব কহিলেন,—"এইবার বোধ হয় সব বুঝিতে পারিয়াছ? এইবার বোধ হয় মর্ম্মে-মর্ম্মে মর্ম্মবোধ করিতে পারিয়াছ? কে জানিত কুসুমের মধ্যে এমনভাবে কালফণী বাস করে! সরলতার অন্তরালে কালকূট প্রচ্ছন্ন থাকে! সুন্দর মুখ জগতের যতকিছু মহাপাপকে এমনই করিয়া ঢাকিয়া রাখে।"

কাসিম। এ হস্তাক্ষর কি আপনার পত্নীর?

খাঁ সাহেব। কেন আপনার কি সন্দেহ হইতেছে? বলিহারি তোমার ধূর্ত্ততাকে! এত অল্পবয়সে এত চাতুরী কোন্ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছিলে?

কাসিম। আপনি এই পত্র বিশ্বাস করিয়াছেন?

খাঁ সাহেব। না করিলে উপায় কই! এমন জ্বলন্ত-নিদর্শন দেখিলে মূর্খেও বিশ্বাস করে।

কাসিম। তাহা হইলে আমার কোন বক্তব্য নাই। আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, আমি অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব।

খাঁ সাহেব। শয়তান! এখনও কি তুই বলিতে চাস তুই নির্দ্দোষ? তুই ফুলকুমারীকে চিনিস না? এ-পত্র তোর উপপত্নী তোকে লেখে নাই?

কাসিম। আপনি বয়সে পিতৃতুল্য—আমার পরম হিতৈষী, আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলিব না। মাথার উপরে আল্লা আছেন, তাঁহার পবিত্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সহিত এ পত্রের কোনই সম্পর্ক নাই!

খাঁ সাহেব দমিয়া গেলেন। কাসিমের তেজোদীপ্ত সরল মুখচ্ছবি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন! এই কি পাপীর উক্তি? অপরাধীর মুখের এমন সহজ-সরল ভাব কি আসে? মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার

মনে হইল হয় এ-যুবক সম্পূর্ণ-নিষ্পাপ অথবা একজন সুনিপুণ অভিনেতা। শেষটাই ঠিক। যুবকের মিথ্যাকথা! পাপীরা মুখে এমনই সাধুতা দেখাইয়া থাকে। না, তিনি তাঁহার সরলতা দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

"দূর মিথ্যাবাদী!"—বলিয়া খাঁ সাহেব তাঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কাসিম পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তরল তরুণ রক্ত গরম হইয়া উঠিল। কঠোরস্বরে কহিলেন,—"সাবধান! খাঁ সাহেব! আপনার এত তিরস্কারেও আমি উত্তেজিত হই নাই! এখনও আমি আপনার পক্ককেশের সম্মান রাখিয়া কথা কহিতেছি! আমার আশঙ্কা হইতেছে পাছে আপনার কঠোর ব্যবহার আমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া বসে!"

খাঁ সাহেবের চক্ষু দিয়া বিদ্যুৎবহ্নি বাহির হইতে লাগিল। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কাসিম পুনরায় অপেক্ষাকৃত সংযতস্বরে কহিলেন,—"পত্নীর কলঙ্ককাহিনীর সংবাদ শুনিয়া, আপনার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নচেৎ ধীরভাবে আলোচনা করিলে আপনি বুঝিতে পারিতেন এ কোন শত্রুর চক্রান্ত! কোন চক্রী আমার এবং আপনার সর্ব্বনাশের জন্য এই ফাঁদ পাতিয়াছে।"

খাঁ সাহেব। শত্রুর চক্রান্ত—তুমি সাধু—আমার পত্নী সতী সাধ্বী! আর কিছু বলিবার আছে?

কাসিম। যদি ধীরভাবে শোনেন, দুই-চারিটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি!

খাঁ সাহেব। বল!

কাসিম। এ-পত্র আপনি কোথায় পাইলেন?

খাঁ সাহেব। পত্রেই ত লেখা আছে পত্রবাহিকার মারফৎ এ-পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

কাসিম। তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোক এই পত্র আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছিল?

খাঁ সাহেব। না, একজন অপরিচিত লোক, আমার এখানে তোমার সন্ধানে আসিয়াছিল, পত্রবাহিকা তোমার সাক্ষাৎ না পাইয়া, তাহার পরিচিত সেই লোকটীর দ্বারা তোমার সন্ধান করিয়া এই পত্র দিতে বলিয়া দেয়।

কাসিম! আমার পত্র, বিশেষতঃ এমন সাঙ্ঘাতিক পত্র আমার হাতে না দিয়া আপনার হাতে দিয়া গেল কেন?

খাঁ সাহেব। ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি! তোমাদের পৈশাচিকলীলা অধিক দিন গোপন রাখা ভগবানের ইচ্ছা নয়।

কাসিম। আপনি ক্রোধান্ধ না হইলে বুঝিতে পারিতেন, এ পত্রখানি আমার হাতে দেওয়া পত্রপ্রেরকের অভিপ্রেত নয়—পত্রখানি আপনার যাহাতে হস্তগত হয়, তাহাই তাহার উদ্দেশ্য।

খাঁ সাহেব। কি উদ্দেশ্যে সে এ কাজ করিবে?

কাসিম। আমার সর্ব্বনাশ সাধন। উভয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ। অথবা আমরা পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরি, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।

খাঁ সাহেব পুনরায় কাসিমের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার যুক্তিতর্কের সারবত্তা যেন কতকটা তাঁহার উপলব্ধি হইল। তিনি ধীরে-ধীরে কহিলেন,—"পত্রের হস্তাক্ষর যে ফুলকুমারীর তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাহা হইলে, তোমার কথা যদি সত্য হয়, ফুলকুমারীরই এই খেলা!" কিন্তু ফুলকুমারী অকারণ তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইবে কেন?

তুমি তাহাকে কখনও দেখ নাই—সে তোমাকে কখনও চেনে না, এমন অবস্থায় শত্রুতা কি সম্ভবে?”

কাসিম। আমিও তাহাকে দেখিয়াছি, সেও আমাকে চেনে——

খাঁ সাহেব। তবে রে মিথ্যাবাদি! এইমাত্র না তুমি বলিলে ফুলকুমারী কে? তাহাকে আমি চিনি না?

কাসিম। সত্যকথাই বলিয়াছিলাম। আপনার পত্নীর নাম ফুলকুমারী বা সেই রমণীই যে ঐ ফুলকুমারী তাহা তখন জানিতাম না। কবিরা উপেক্ষিতা রমণীর সহিত কালফণীর তুলনা করিয়া থাকেন—কাব্যে এ-কথা পড়িয়াছি. কিন্তু বাস্তব জগতে সেই সত্যের সহিত এই প্রথম পরিচয়!

খাঁ সাহেব। প্রহেলিকা ছাড়িয়া সাদা কথায় বল, ব্যাপার কি?

কাসিম। মনে করিয়াছিলাম এ-লজ্জার কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিব না, কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেদিন যদি সঙ্গে-সঙ্গে সকল বিষয় আপনার গোচর করিতাম, তাহা হইলে আজ অকারণ এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। আজ চারিদিন হইল, সন্ধ্যার পর আমি আমার উদ্যানে বসিয়াছিলাম—একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল, সহসা পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া দেখি, আমার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব, সুন্দর যুবতী। তেমন রূপ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। যুবতী সহাস্যাধরে আমার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, তাহার পরিচয় দিয়া, আমার প্রেমপ্রার্থিনী হইল। কহিল,—‘স্বামী আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ কর। পূর্ব্বে তোমাকে আরও দুই-একবার দেখিয়াছি, দেখিয়া উন্মাদিনী হইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি ইত্যাদি।’ বলা বাহুল্য আমি তাহার

প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। আমার মত যুবকের পক্ষে সে প্রলোভন ত্যাগ করা কত কঠিন, সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। দুষ্কর হইলেও আমি হৃদয়ের অমিতবলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। রমণী বিষধরীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, পরক্ষণে শান্ত হইয়া আমার চরণে ধরিল, তথাপি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়াতে, রোষে-ক্ষোভে গর্জ্জিয়া-গর্জ্জিয়া সে আমায় বলিয়া গিয়াছিল,—'আমি তোমায় এমন দংশন করিব, যাহার জ্বালায় তোমায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে হইবে! মূঢ় যুবক! এ-অর্ব্বাচীনতার ফল হাতে-হাতে পাইবে! আজ হইতে তোমার অদৃষ্টাকাশে আমি দুষ্টগ্রহের মত উদিত হইলাম। সাবধান!' তখন তাহার ঐ-উক্তির একটা গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি নাই, আজ দেখিতেছি সত্যই সে আমার অদৃষ্টগগনে কুগ্রহের মত উদিত হইয়া আমার ভাগ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে বসিয়াছে! তাহার একটা ফুৎকারে আমার যশোদর্পণ সমল হইয়া উঠিয়াছে—আমার সুনাম অতল-জলধিতলে ডুবিয়া গিয়াছে! হায় কুলটা! তোমার অসাধ্য জগতে কি আছে!

কাসিমের গণ্ড বহিয়া দুই-তিন ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রহমন খাঁ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! একবার ভাবিতেছেন যুবক সরলতার আধার, সত্যবাদী; তাহার অনুমানই ঠিক। উপেক্ষিতা ফুলকুমারী লালসার তাড়নায় উন্মাদিনী হইয়া, যুবকের সর্ব্বনাশের জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে! নচেৎ এত লোক থাকিতে এ-পত্র তাঁহার নিকট আসিবে কেন! তিনি তাঁহাকে প্রহার করিয়া, লাঞ্ছিত করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, এ পত্র তাঁহার হাত পড়িলে, সে অপরাধের কতকটা প্রতিশোধও লওয়া হইবে—শয়তানী এক ঢিলে দুইটী পাখী মারিতে উদ্যত

হইয়াছে। আবার ভাবিতেছেন, না, যুবকের সবই কল্পিত কথা—আগাগোড়া মিথ্যা! আল্লার খেলা, পত্রখানা দৈবানুগ্রহেই তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন,—"ধরিয়া লইলাম তোমার কথা সত্য, কিন্তু ফুলকুমারী কোথায়?"

কাসিম। তাঁহার পিতৃভবনে।

খাঁ সাহেব। বাস্তবিক আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। পত্রে লেখা আছে, সে কুলত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছে, কিন্তু ঐ-কথাটা সত্য কিনা, সত্যই সে কুলত্যাগিনী হইয়াছে কি না, অগ্রে তাহার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য ছিল। রেজা খাঁ-----

রেজা খাঁ আসিয়া অভিবাদন করিল। খাঁ সাহেব কহিলেন,—"শীঘ্র রোশন আলিকে আমার নিকট লইয়া আইস। আজ রাত্রেই আনা চাই। যদি না আসিতে চায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া আসিবে।"

রেজা খাঁ আরও দুইজন প্রহরী সঙ্গে লইয়া রোশন আলির ভবনে উপস্থিত হইল এবং বিনীতভাবে খাঁ সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। রোশন আলি বুদ্ধিমান এবং চতুর লোক। ভগিনী পতির আহ্বানে না যাইলে, তাহাকে যে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল, সুতরাং রেজা খাঁর সহিত যাইতে কোনরূপ আপত্তি করিল না।

রোশন আলি যথাসময়ে খাঁ সাহেবের সকাশে উপনীত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ফুলকুমারী—তোমার ভগ্নী কোথায়?"

এইজন্যই যে তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং পথে আসিতে-আসিতে কি উত্তর দিবে তাহারও একটা মীমাংসা করিয়া আসিয়াছিল। এখানে আসিয়া কাসিম

আলিকে দেখিয়া, যথাসাধ্য সকল কথা সত্য বলিতে মনস্থ করিল। কহিল,—"তাহার আর নাম করিবেন না, সে মরিয়াছে।"

খাঁ সাহেব। মরিলে আমি সুখী হইতাম। কোথায় সন্ধান জান কি?

রোশন। প্রথমে চাঁপাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হয়—চাঁপা বাহিরে অপেক্ষা করে——

খাঁ সাহেব। সে কাসিম আলির উদ্যানে প্রবেশ করে। তাহার পর?

রোশন। হাঁ, তাই বটে। এই দেব-চরিত্র যুবকের নিকট তাহার পাপ-অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়াতে, সেস্থান হইতে চলিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে আর একজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, শুনিলাম পাপিষ্ঠা তাহারই সহিত প্রস্থান করিয়াছে।

খাঁ সাহেব। এ ব্যক্তি কে?

রোশন। চাঁপা তাহাকে চিনিতে পারে নাই, দূর হইতে এই ঘটনা দেখিয়া সে সরিয়া পরে এবং বাড়ী আসিয়া আমাকে সংবাদ দেয়। আমি তাহাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু কোন নিদর্শনই পাই নাই।

খাঁ সাহেব। সেই রাত্রে আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?

রোশন। মা বারণ করিলেন, বলিলেন যদি সন্ধান পাওয়া যায়, এ সংবাদ শুনিলে জামাই আর তাহাকে গ্রহণ করিবেন না।

খাঁ সাহেব। চাঁপা—তোমার ভগ্নীর অভিসার-সঙ্গিনী কোথায়?

রোশন। তাহার কোনই অপরাধ নাই। ফুলকুমারী যে মন্দ অভিপ্রায়ে বাটীর বাহির হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না। তাহাকে অন্যরূপ বুঝাইয়া সঙ্গে লইয়াছিল। কাসিম সাহেবের উদ্যানে প্রবেশ

করিয়া, যখন ইহার সহিত আলাপ বা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয় তখনই চাঁপা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে।

রোশন আলির এই কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। চাঁপাকে রক্ষা করিবার জন্যই এত কাণ্ড। চাঁপার সহিত অনেকদিন হইতে তাহার একটা অপবাদ আছে। সম্ভবতঃ সেইজন্যই পাছে তাহার কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় রোশন আলি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফুলকুমারী কোন্ মহাজনকে কাণ্ডারী করিয়া, অকূলে যৌবনতরি ভাসাইয়া চলিয়াছেন, চাঁপাও জানে, সুতরাং রোশন আলিও অবগত আছে—কিন্তু সে-কথা প্রকাশ পাইলে, জাফর সাহেব রাজ্যমধ্যে ধনসম্পদে বা প্রতাপে যত-বড় লোকই হউন না কেন, আবদুল রহমন খাঁ বিরূপ হইলে, তাঁহার স্কন্ধের উপর মস্তক অধিকক্ষণ বজায় থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ ফুলকুমারী কুলত্যাগিনী হইলেও ভগিনী, সুতরাং কলঙ্কিত পতির কোপানলে তাহাকে ভস্মীভূত হইতে দেখিতে ইচ্ছা করে না। এইসকল কারণে পথে আসিতে-আসিতে উর্বরমস্তিষ্ক রোশন আলি এই সকল মৎলব আঁটিয়া আসিয়াছিল।

খাঁ সাহেব কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে তোমার ভগ্নী স্বেচ্ছায় অকূলে ভাসিয়াছে—কেহ তাহাকে এ-কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয় নাই?"

রোশন। কে আর প্রবৃত্তি দেবে?

খাঁ সাহেব। কেন এই কাসিম আলি। তুমি গণ্ডমূর্খ। বাড়ীতে থাক, কোন সংবাদই রাখ না। দেখ তোমার ভগ্নী কি লিখিতেছে।

এই বলিয়া ফুলকুমারীর পত্রখানা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। রোশন আলি পত্রখানি পাঠ করিতে-করিতে দুই-তিনবার

কাসিমের মুখের দিকে চাহিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে কহিল,—"কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চাঁপার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে এই যুবককে সচ্চরিত্র বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আর উভয়ের মধ্যে যদি গুপ্ত-প্রণয়ই জন্মিয়াছিল, সে-ক্ষেত্রে ফুলকুমারী কাসিমকে পত্র লিখিলে, সে-পত্র কাসিম আপনাকে দেখাইল কেন? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ যেন আমার নিকট গোলকধাঁধা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

খাঁ সাহেব। কাসিম আমাকে পত্র দেখায় নাই, এ-পত্র তাহার হাতেও পড়ে নাই—কোনরূপে আমার হস্তগত হইয়াছে।

রোশন। কোনরূপে আপনার হস্তগত হয় নাই, আপনার হাতে যাহাতে এ-পত্র পড়ে, তাহারই চেষ্টা হইয়াছে। এইপত্রই এই যুবকের নির্দ্দোষিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—তাহার সাধুচরিত্রের জ্বলন্ত নিদর্শন!

খাঁ সাহেব। তুমি এখন যাও, যদ্যপি সন্ধান পাও, আমাকে সংবাদ দিও।

রোশন আলি প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিল। খাঁ সাহেব কাসিম আলির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, উভয় করে, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"কাসিম! আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, তোমার পায়ে ধরিলে তোমার অকল্যাণ হইবে, তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি আমায় ক্ষমা কর! আল্লা না করুন, যদি কখনও আমার অবস্থায় পড়, বুঝিতে পারিবে এ-অবস্থায় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—সদসৎ বিবেচনা করিতে পারে না। আমি উন্মত্ত হইয়া———

কাসিম অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে বাধা দিতে উদ্যত হইলে, খাঁ

সাহেব কহিলেন,—"না, আমায় বাধা দিও না, আমার যাহা ব্যক্তব্য বলিতে দাও। ইহাতে আমার পাপের অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমি জানি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে—তোমার উন্নত চরিত্র, তোমার দেব-প্রকৃতি আমার মত নরাধমকে মার্জ্জনা করিবে। পুরুষ সব সহ্য করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীর ব্যাভিচার সহ্য করিতে পারে না। যে স্ত্রীর উপর আমার পূর্ণবিশ্বাস ছিল, সহসা তাহার বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন পাইয়া, আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল। আমি তোমাকে দোষী ভাবিয়া তিরস্কৃত করিয়া, এখন অনুতপ্ত হইয়াছি। বল-বল কাসিম! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? হে সদাশয় সাধু! বল এ-ঘটনা ভুলিয়া যাইবে? আমাকে কি আবার সহোদরের ন্যায় সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারিবে?"

কাসিম গাত্রোত্থান করিয়া রহমন খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"এ-প্রসঙ্গ আমরা আর উত্থাপন করিব না। রাত্রির কুস্বপ্নের মত এ-দুর্ঘটনাকে আমি বিস্মৃত হইব। পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে ভক্তি করিব, সহোদরের মত ভালবাসিব এবং বর্ত্তমান দুর্ঘটনার জন্য সুহৃদের মত সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া আপনার হৃদয়ক্ষত আরোগ্য করিতে প্রয়াস পাইব।"

বহুক্ষণ দুইজনে পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলেন। উভয়ের বিগলিত অশ্রু-প্রবাহে উভয়ে অভিষিক্ত হইলেন—সে-পবিত্রঅশ্রুধারায় উভয়ের মনোমধ্যে সঞ্চিতমালিন্যরাশি বিধৌত হইয়া, আবার বান্ধবতার রত্নসিংহাসন তথায় সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হইল।

পাপিষ্ঠা ফুলকুমারী এবং বর্ত্তমানে তাহার পাপানুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক জাফর খাঁ, সাধুপ্রকৃতি কাসিম আলির অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশে

পাপবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যে পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং যাহার সাফল্যের প্রতি কৃতনিশ্চয় হইয়া, তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতেছিল, ভগবানের ন্যায়-বিধানে তাহা পণ্ড হইয়া গেল। তিনি যাহাকে রক্ষা করেন, মানুষের সহস্র-চেষ্টাও তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা

রজনী প্রভাতে জয়ন্তী সাধুচরণে প্রণত হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে, সাধু কহিলেন,—"একটু অপেক্ষা কর মা! আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমারও গন্তব্য-পথ ঐ-দিকে। পথে সঙ্গী পাইলে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে-কহিতে চলিলে পথশ্রমের অনেকটা লাঘব হয়।"

সাধুও গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহার কমণ্ডলু আদি গ্রহণ করিয়া গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইলেন। তখন সবেমাত্র উষার অরুণরাগ প্রকৃতির ললাটে শোভিত হইয়াছে। সেই নবাগত দিবালোক পাইয়া, জলে-স্থলে যে যেখানে সুষুপ্ত ছিল, জাগ্রত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ-সময় পার্ব্বত্যপ্রদেশের ভাব যেমন স্নিগ্ধ, তেমনই গম্ভীর। শীতল সমীর হিল্লোলে-হিল্লোলে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বহিতেছে—শত-সহস্র নানা আকারের, নানাবর্ণের বিহগকুল কল-নিনাদে পার্ব্বতীয় বন মুখরিত করিতেছে—লক্ষ-লক্ষ বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণে পতিত হইবার জন্যই যেন বৃন্তচ্যুত হইয়া বৃক্ষতলে একত্র হইতেছে।

জয়ন্তী সাধুর সহিত পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যে বৃক্ষসমাচ্ছন্ন এক সমতলক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এইবার সুগম পন্থা পাইয়া, তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জয়ন্তী কহিলেন,—"সেদিন নদীতটে বসিয়াছিলাম—পদ-নিম্নে কল-কলনাদ করিয়া জলের অনন্ত-প্রবাহ কোন্ অনির্দ্দিষ্ট সাগরের অভিমুখে ছুটিতেছিল, তাহাই দেখিতে-দেখিতে ভাবিতেছিলাম, মানুষের জীবনপ্রবাহও এমনি করিয়া কাল-সিন্ধুতে গিয়া পড়ে। সেইখানেই কি পরিসমাপ্তি? আপনি বলিয়াছিলেন না,—কথাটা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। মানুষ মরিলেই ত সব ফুরাইল, তাহার সুখদুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণার ঐখানেই ত নিবৃত্তি হইল।"

সাধু। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তুমি এবং তোমাদের গ্রামের সুরবালা একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়া, তুমি বালবিধবা হইতে না এবং সে পতিপুত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত না। কেন এমন হইল বল দেখি? তুমি সেই শৈশবে এমন কি পাপ করিয়াছিলে, যাহার জন্য তোমার বৈধব্য ঘটিল এবং সুরবালাই বা কি পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিল, যাহার ফলে দিনে-দিনে সংসারে তাহার সুখের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল?

জয়ন্তী। ঐ-কথা আমারও মনে উদিত হইয়াছিল কিন্তু আমি তাহার কোনই মীমাংসা করিতে পারি নাই।

সাধু। তুমি আমি যাহাকে মৃত্যু বা শেষ বলি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা শেষ নহে—প্রারম্ভ। মৃত্যু নব-জীবনের প্রথম সোপান। স্বর্গ বা নরক রাজ্যে প্রবেশের—সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার মুক্তদ্বার।

জয়ন্তী। সমস্তই আমার নিকট প্রহেলিকা বোধ হইতেছে।

সাধু। মানুষ মরে না—তাহার ভৌতিক-দেহের বিনাশ হয় মাত্র। জীবাত্মা অবিনশ্বর—তাহার আশ্রয়ীভূত দেহ নশ্বর।

জয়ন্তী। বুঝিলাম এই পঞ্চভৌতিক দেহ নষ্ট হয় কিন্তু ঐ-দেহকে আশ্রয় করিয়া, যে জিনিষটা তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করে, তাহার মধ্যে সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি জন্মাইয়া দেয়, তাহার মৃত্যু হয় না। কিন্তু সে যায় কোথায়?

সাধু। দেহান্তর আশ্রয় করিতে। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে। জরাজীর্ণ-স্থবির দেহ পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবরে নব সুখের অনুসন্ধান করিতে।

জয়ন্তী। তাহা যেন বুঝিলাম কিন্তু এ-জন্মের পাপপুণ্য জন্মান্তরে সংক্রামিত হয় কেমন করিয়া?

সাধু। দেহীর যখন জীবনাবসান হয়, তখন তাহার জীবাত্মা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করে।

জয়ন্তী। একটু অপেক্ষা করুন—সূক্ষ্ম দেহটা কি? উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

সাধু। মানব-চক্ষুর অগোচরীভূত আলোকময় দেহ। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, সুখ দুঃখ লইয়া, সূক্ষ্ম-রাজ্যে গমন করে। মানুষ মরে কিন্তু তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় না। কর্ম্মের আকর্ষণে আবার ধরাতলে আসিয়া স্থূলদেহ পরিগ্রহ করে। তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ছায়ার মত তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি থাকে, তদনুসারে এই পৃথিবীতলে আসিয়া সুখ বা দুঃখ উপভোগ করে। এ পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। যে যেমন কর্ম্ম করে, জন্মান্তরে আবার সেইরূপ গতি লাভ করে।

জয়ন্তী। তবে কি এ-যাতায়াতের বিরাম নাই?

সাধু। যতদিন কর্ম্মবন্ধন থাকিবে—যতদিন বাসনার বিরাম না ঘটিবে, ততদিন তাহার আকর্ষণে পড়িয়া আসিতেই হইবে।

জয়ন্তী। কিসে এ-বন্ধন ছিন্ন হয়?

সাধু। সাধনার দ্বারা। বাসনার নির্ব্বাণেরই নাম মুক্তি। ভগবানের বিশেষ করুণা না থাকিলে, সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

জয়ন্তী। সাধনা—সেও ত একটী কর্ম্ম? তবে কর্ম্ম শেষ হইবে কেমন করিয়া? মুক্তি-কামনা—সেও ত বাসনার নামান্তর?

সাধু। ঐহিক কামনা এবং পারলৌকিক কামনা। ঐহিক কামনা সিদ্ধ হইলে, সংসারে সুখ-সম্পদ বাড়ে আর পারলৌকিক কামনায় ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। ফলাফলের কামনাশূন্য হইয়া যে সাধনা, তাহাই নির্ব্বাণলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

জয়ন্তী। এ-সকল অতি দুরূহ বিষয়। আমার মত জ্ঞানহীনার সকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক মাঝে-মাঝে এমনই করিয়া বুঝাইয়া দিলে, কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিব।

সাধু। তোমার বুদ্ধি খুব প্রখরা, সহজেই তুমি বুঝিতে পারিবে। আজ এইপর্য্যন্ত। ঐ তোমার পথ—আমি অন্যপথে কার্য্যান্তরে চলিলাম, সময়ে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

জয়ন্তী সাষ্টাঙ্গে, গুরুচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন এবং মধ্যাহ্নে নিবিড়ারণ্যে মাধবগিরির সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মাধবগিরি কন্যার অঙ্গে আঘাত-চিহ্ন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়ন্তী আনুপূর্ব্বিক তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। জাফর্ খাঁর উপর তাঁহার যে জাতক্রোধ ছিল, তাহা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। সন্ধ্যার সময় অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পাইয়া

জয়ন্তী কহিলেন,—"বাবা সৌভাগ্যক্রমে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাঁহাকে দর্শন করিবার পূর্ব্ব হইতেই আমার ভাবান্তর ঘটিয়াছে। এরূপভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে আর অভিলাষ নাই। আমি সেই মহাপুরুষকে গুরুপদে বরণ করিয়াছি। একপক্ষ পরে নীলাচলে প্রস্থান করিব। সেইস্থানেই আমার জীবনের শেষ অংশ টুকু অতিবাহিত হইবে।"

মাধবগিরির চক্ষু হইতে দর-দরধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"উত্তম সংকল্প মা! আমি তোমার এ-সাধু উদ্দেশ্যে বাধা দিব না। যে বংশে তোমার জন্ম, তাহার উপযুক্ত পন্থাই ঐ। ইংরাজ ও মুসলমানের মধ্যে এই যে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে, এই অনলে আমি যথাসাধ্য ইন্ধন যোগাইব। যুদ্ধশেষে যদি জীবিত থাকি আমিও এ-কার্য্য পরিত্যাগ করিব।"

জয়ন্তী। যাহারা এতদিন আপনার সাহচর্য্য করিল তাহাদের দশা কি হইবে?

মাধব। প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সহচরেরা এখন আর কেহই দস্যুতা করে না। তাহারা এখন সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছে। সকলেই সংসারী—কৃষিকার্য্য অনেকেরই ব্যবসা। যাহারা প্রথমে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত, এখন তাহাদের মতিগতি ফিরিয়াছে। আমি দল ভাঙ্গিয়া দিলে, কেহ কৃষিকার্য্যদ্বারা, কেহবা ইংরাজের নিকট সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

জয়ন্তী। দাদা কি ইংরাজ শিবিরে?

মাধব। হাঁ, ইংরাজ-সেনাপতি তাহাকে খুব স্নেহ করেন। সে এখন একজন পদস্থ-কর্ম্মচারী। যোগানন্দ তিন-চারিদিন পূর্ব্বে

এখানে আসিয়াছিল, তাহার পরামর্শেই আমার দলের অধিকাংশ লোক গোপনে আমেদাবাদে প্রবেশ করিয়াছে।

জয়ন্তী। আপনার কি বিশ্বাস এ-যুদ্ধে ইংরাজেরাই জয়ী হইবে?

মাধব। নিশ্চয়। তাহাদের শিক্ষা অপূর্ব্ব। অস্ত্রশস্ত্রও উৎকৃষ্ট। তাহাদের সাহস এবং অধ্যবসায়ের তুলনা নাই। এই গুণেই তাহারা একদিন সমগ্র ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিতাপুত্রীতে বসিয়া বিবিধ-বিষয়ের আলোচনা হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উভয়ে বিশ্রামার্থ আপন-আপন কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রি প্রভাতে জয়ন্তী জাগ্রত হইয়া দেখিল, নির্জ্জন বনভূমি কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কুটীর শ্রেণীর সম্মুখস্থ মুক্ত-প্রাঙ্গণে গেরুয়া বসন পরিহিত বহুসংখ্যক যোদ্ধপুরুষ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। সকলেরই কটীতটে কোষনিবদ্ধ অসি, পৃষ্ঠদেশে ঢাল, দক্ষিণহস্তে ভীমবর্শা। সকলেরই মুখে সাহস, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সুস্পষ্ট ছায়া প্রতিফলিত। সকলে যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে মাধবগিরি তাঁহার কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার পরিধানে রক্তাম্বর, হস্তে দীর্ঘ তরবারি। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র, সমবেত যোদ্ধবর্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তিনি স-তরবারি দক্ষিণহস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহার পর জয়ন্তীর নিকট বিদায় লইয়া, অগ্রসর হইলেন। সমগ্র যোদ্ধপুরুষ "হর-হর ব্যোম!" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। সে সিংহনাদে সমস্ত আরণ্যভূভাগ কাঁপিয়া উঠিল—পক্ষিগণ কুলায় ত্যাগ করিয়া সন্ত্রস্তভাবে আকাশে উড়িল—বন্যপশু বনের মধ্যে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

মাধবগিরি ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া রণরঙ্গে ঝম্প দিতে চলিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

পরদিবস উদয়াচলশিখরে অংশুমালী সমুদিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই ইংরাজের বজ্রনাদী কামানসকল গর্জ্জিয়া উঠিল। অশ্বারোহী এবং পদাতিক সেনা নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তে রণক্ষেত্র শবসমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। প্রভাত রবি ধূমে আচ্ছন্ন হইল। কামানের শ্রবণভৈরব-গর্জ্জনে, বন্দুকের "গুড়ুম-গুড়ুম" শব্দে, অশ্বের হ্রেষারবে, বীরের হুঙ্কারে, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে কর্ণকুহর বধির হইবার উপক্রম হইল।

প্রবলপবনে ধূমরাশি অপসারিত হইলে হার্ব্বাট দেখিলেন, পূর্ণবেগে একদল অশ্বারোহী বর্শাহস্তে ছুটিয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ দুইটী কামান তাহাদের সম্মুখভাগে স্থাপিত হইল। গোলন্দাজেরা আদেশের অপেক্ষায় স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান। অশ্বারোহীদল আরও নিকটবর্ত্তী। এখনও ইংরাজ-সৈন্য নীরব-নিস্পন্দ। যখন তাহারা মাত্র অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত, তখন সেনাপতির ইঙ্গিতে গোলন্দাজেরা কামান দাগিতে আরম্ভ করিল। করকাপাতে ক্ষেত্রস্থ শস্য যেমন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, ইংরাজের গোলার আঘাতে তেমনই করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া নবাব-সৈন্য মরিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে অর্দ্ধেকের উপর অশ্বারোহী ধরাশয়ী হইল, তথাপি তাহারা হটিল না। তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই যেন ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যোগানন্দ দেখিলেন তাহারা মৃত্যুপণ করিয়া ইংরাজের

কামান কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। যদি কৃতকার্য্য হয়, ঐ-কামানের মুখ ফিরাইয়া, ইংরাজের অস্ত্র সাহায্যে তাহাদেরই বলক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তিনি দুই-শতমাত্র অশ্বারোহী লইয়া, তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলির-আঘাতে আরও কতকগুলি মরিল। বন্দুকে, গুলি পুরিবার আর অবকাশ নাই দেখিয়া, সঙ্গিন উদ্যত করিয়া আক্রমণ করিল। নবাবের অশ্বারোহী সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না—হতাবশিষ্ট অতি অল্পমাত্র যাহারা রহিল, তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল কিন্তু পথার্দ্ধ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ইংরাজ সিপাহীর গুলিতে প্রাণ হারাইল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল কিন্তু কোন পক্ষই আপন-আপন বলক্ষয় ভিন্ন বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যাসমাগমে রণশ্রান্ত উভয়পক্ষই বিশ্রামার্থ স্ব-স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রি যখন একপ্রহর, নগরের দক্ষিণপ্রান্তে কতকগুলি গৃহচূড়া অগ্নিসংস্পর্শে ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে অনল প্রবল-পবনসাহায্যে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। নগর-বাসী অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। রণক্লান্ত সৈনিকেরা পর্য্যন্ত বিশ্রাম পরিহার করিয়া, তাহাদের সাহায্যার্থে ছুটিল। সেই গোলযোগের মধ্যে নগরের বিভিন্নস্থানে কে বা কাহারা রটাইয়া দিল, ইংরাজ আসিয়া পড়িয়াছে—তাহারা নগর প্রবেশ করিয়াই, নগরে আগুণ ধরাইয়া দিয়াছে। মুহূর্ত্তে সেই জনরব নগরময় এমন কি কেল্লায় পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভীতত্রস্ত নগরবাসী অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া নগরের দক্ষিণভাগে ছুটিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেইস্থলে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া জুটিল।

নগরের যখন এইরূপ অবস্থা—নগরবাসী সাধারণ গৃহস্থ এবং যোদ্ধ্বর্গ যখন মিথ্যা জনরবে বিভ্রান্ত হইয়া উন্মত্তবং নগররক্ষার্থ দক্ষিণপ্রান্তে ছুটিতেছিল, ঠিক সেইসময়ে মুক্ত তরবারি এবং বর্ষাহস্ত প্রায় দুই-তিনশত লোক হুহুঙ্কার দিয়া নগরের উত্তরপ্রান্তরক্ষী সৈন্যদলের উপর পড়িল। এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব আক্রমণে এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের সংখ্যাবধারণে অসমর্থ হইয়া, রক্ষিসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিয়াছিল, ইহারা ইংরাজের অগ্রগামী সৈন্য—পশ্চাতে বহু-সহস্র সিপাহী এবং গোরা পল্টন আসিতেছে। তাহাদের অধিকাংশই নৈশ-আক্রমণকারীদের বর্ষায় বিদ্ধ হইয়া অথবা তরবারিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

এইসময়ে আরও একটী ঘটনা ঘটিল। পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে নক্ষত্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া একদল ইংরাজ অশ্বারোহী বাহির হইতে উত্তরপ্রান্ত আক্রমণ করিল। ভিতর এবং বাহির হইতে আক্রান্ত মুসলমান সৈন্য পলায়ন করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল! দেখিতে-দেখিতে নগরের অপর তিনপ্রান্তও আক্রান্ত হইল এবং একরূপ বিনাবাধায় ইংরাজ-সেনা আসিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় "গুড়ুম-গুড়ুম গুম"—করিয়া আবার ব্রিটিশের ভীমনাদী কামান গর্জ্জিয়া উঠিল এবং তাহার গোলা সকল দুর্গমধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সৌধকিরীটিনী আমেদাবাদ নগরীর এক শোচনীয় রূপান্তর সংসাধিত হইল। সৌধমালা গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইতে বসিল। নগরের রাজপথে শোণিতের স্রোত বহিতে লাগিল।

রহমন আলি নবাবের সহিত পরামর্শ করিয়া, দুর্গের প্রধান তোরণ মুক্ত করিয়া শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন।

নবাব স্বয়ং কাসিম আলি এবং জাফর খাঁকে সঙ্গে লইয়া দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া, আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের গোলা-গুলির আঘাতে বহু-ইংরাজ-সেনা মরিল. তথাপি তাহারা দুর্গপ্রাকারের দিকে অগ্রসর হইল।

এদিকে রহমন খাঁ পরিচালিত অশ্বারোহী সেনা, দুর্গবাহিরে আসিয়া মহামারি বাধাইয়া দিল। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, ইংরাজ-বাহিনী ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন এবং বাহির হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। 'সম্মুখে এবং পশ্চাতে আক্রান্ত হইলে, তাহারা অধিকক্ষণ রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তিনি ইংরাজের বহু গোরা এবং সিপাহী সৈন্যের মৃতদেহে নগরপথ সমাচ্ছন্ন করিতে-করিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন-সময়ে বন্দুকের একটা গুলি আসিয়া, তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইল। তাঁহার হাত হইতে শোণিতাক্ত তরবারিখানা মাটীতে পড়িয়া গেল—সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও অশ্ব হইতে গড়াইয়া ভূতলে পড়িলেন। সেনাপতির নিধনে নিরুৎসাহ মুসলমান-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কতক আশ্রয় আশায় দুর্গাভিমুখে ফিরিবার চেষ্টা করিল, কতক বা ইংরাজের সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিবার প্রয়াস পাইল। বলা বাহুল্য তাহাদের অধিকাংশই ধরাশয্যায় শয়ন করিল।

ইংরাজ-সৈন্য জয়োল্লাসে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে-গর্জ্জনে নবাব কাঁপিয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে খাঁ সাহেবের পতনের সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি কাসিমকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"কাসিম! এই-মুহূর্ত্ত হইতে তোমার উপর সমগ্র সৈন্য পরিচালনার ভার দিলাম। শেষ-মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিব। ইংরাজ আমাকে কখনই ক্ষমা করিবে না—হয় দুর্গরক্ষা

করিব, নয় মরিব। জীবিত থাকিতে কখনই আত্মসমর্পণ করিব না।

কাসিম কুর্ণিশ করিয়া কহিলেন,—"হজরৎ! ফলাফল আল্লার মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। আমার শরীরের শেষ-রক্তবিন্দু দিয়া আদেশ প্রতিপালন করিব।"

নবাব সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কাসিম দ্রুতবেগে তরবারি হস্তে বহির্গত হইলেন।

আর দুর্গরক্ষা হয় না। রজনীর অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে যবন-দুর্গের স্বাধীনতার পরমায়ুও অবসান হইয়া আসিল। গোলার উপর গোলা আসিয়া দুর্গপ্রাকারে আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রাকারের একস্থান ভগ্ন হইল। প্রাকারের বাহিরে গভীর পরিখা দুর্গ বেষ্টন করিয়া আছে। পরিখা জলে পূর্ণ। সন্তরণ দিয়া পরিখা পার হইতে না পারিলে প্রাকার-সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া যাইবে না। দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া যবনসেনা এখনও সিংহ-বিক্রমে শত্রুর উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। সে অনলময়ী করকাপাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। ইংরাজ-সেনাপতি কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি এক উপায় স্থির করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশে বহুসংখ্যক কাষ্ঠময় ভেলা রচিত হইল। তাহার পর যোগানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন,—"একদল গোলন্দাজকে ঐ ভগ্ন প্রাকারের সম্মুখে স্থাপন করিয়া, অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতে আদেশ কর। সে গোলাবর্ষণের সম্মুখে কেহ যেন তিষ্ঠিতে না পারে। শীঘ্র উক্তস্থান শত্রুশূন্য হইবে, সেই অবকাশে পরিখার উপর বড়-বড় কাঠের ভেলা ভাসাইয়া, তাহার সাহায্যে পরিখা পার হইতে

হইবে। ঐ সামান্য বাধাটা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, দুর্গ আমাদের অধিকৃত হইবে।”

যোগানন্দ সেনাপতির আদেশ পালন করিতে ছুটিলেন। কিন্তু সাহেব সে কর্ম্ম যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, তত সহজসাধ্য হইল না। ভগ্ন প্রাকারের সম্মুখে ইংরাজের কামান বসিতে দেখিয়া, কাসিম আলিও সেইস্থানে গোটা-দুই-কামান আনিয়া স্থাপন করিলেন! তখন উভয়-পক্ষে কামানে-কামানে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উভয়পক্ষেই বহুলোকক্ষয় হইল।

মাধবগিরি যোগানন্দকে অনুসন্ধান করিয়া কহিলেন,—“আমার দলে বেশী বন্দুক নাই—আমার সহিত একদল বন্দুকধারী সিপাহী দাও।”

যোগানন্দ তৎক্ষণাৎ একশত সিপাহীকে তাঁহার অধীনে স্থাপন করিলেন। মাধবগিরি দুর্গের একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, সিপাহী-দিগকে আহ্বান করিয়া করিয়া কহিলেন,—“ভাই সকল! বন্দুক চালাইতে-চালাইতে অগ্রসর হও—আমরা তোমাদের অনুসরণ করিব।”

সিপাহী বন্দুক উদ্যত করিয়া বেগে অগ্রসর হইল এবং অচির-কাল মধ্যে পরিখার নিকট উপস্থিত হইল। মাধবগিরি পুনরায় গম্ভীরনাদে কহিলেন,—“প্রাকারের উপর, শত্রুর উপর অনবরত গুলি চালাও—তোমাদের সাফল্যের উপর জয়পরাজয় নির্ভর করি-তেছে।” তাহার পর তাঁহার সঙ্গীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “এস যাহার সাহস থাকে, আমার সঙ্গে এস। এইরূপে মরণের মধ্য দিয়াই বিজয়লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিতে হয়।”

তাহার পর সর্ব্বপ্রথমে মাধবগিরি, তৎপরে তাঁহার দৃষ্টান্তের

অনুসরণ করিয়া একজন, দুইজন, দশ-বিশ—দেখিতে-দেখিতে দুই-তিনশত গৈরিকধারী যোদ্ধৃপুরুষ কেবলমাত্র তরবারি বা বর্ষাহস্তে পরিখার মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। মুসলমানেরা দুর্গপ্রাকার হইতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া, অনেককে হতাহত করিয়া ফেলিল, কিন্তু সিপাহীদের নিক্ষিপ্ত গুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অধিকক্ষণ আত্মরক্ষা করা তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল।

সানুচর মাধবগিরি সন্তরণ দিয়া পরিখা পার হইলেন। সেইস্থানে দুর্গপ্রাকার সামান্য ভগ্ন হইয়াছিল। পরিখা হইতে প্রাকারমূলে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে, তাঁহারা অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না। একজন সন্তরণকারী ভগ্নস্থানের একটা প্রস্তরখণ্ড ধরিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। হতভাগ্য পরিখামধ্যে গড়াইয়া পড়িল। সেই সময়ে সিপাহীরা মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করিয়া, সে স্থানটা কতকটা শত্রুশূন্য করিয়া ফেলিল। মাধবগিরি মৃত সৈনিকের হাত হইতে বর্ষাটা লইয়া ভগ্নস্থানের একস্থানে কৌশলে আবদ্ধ করিয়া, তৎসাহায্যে উপরে উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার দেখাদেখি এক, আর এক, আরও একজন উঠিল। তখন হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মুসলমানেরা কেহ তরবারি, কেহ সঙ্গিন লইয়া তাঁহাদের উপর পতিত হইল।

দেখিতে-দেখিতে প্রায় অধিকাংশ লোক দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া পড়িল। যাহারা পারিল না, সন্তরণ দিয়া পরপারে ফিরিয়া আসিল। উষার আলোক-আঁধারের মধ্যে উভয়-দলে যে যুদ্ধ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। হার্কাট দূর হইতে এ-দৃশ্য দেখিলেন, তাঁহার বীরহৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটা বিষয়ে তিনি বড়ই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। মাধবগিরির লোকসংখ্যা অতি-অল্প—

যদি উপযুক্ত সময়ে সাহায্য যাইয়া না পড়ে, ঐ মুষ্টিমেয় লোক কয়জন, কতক্ষণ ঐ বিপুলবাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে। তিনি স্বয়ং গোলন্দাজ-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দুর্গপ্রাকার আরও খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেখানে যে দুইটা কামান ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই বহুসংখ্যক কাষ্ঠভেলক পরিখা-সলিলে ভাসাইয়া, তাহার সাহায্যে একপ্রকার ভাসমান সেতু নির্ম্মিত হইল। সেই সেতুর উপর দিয়া সর্ব্বাগ্রে হার্ব্বার্ট, তাঁহার পশ্চাৎ যোগানন্দ, তাহার পর একে-একে, দুইয়ে-দুইয়ে বহুসৈন্য পরিখা পার হইয়া দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিল। তখন বন্দুক কামানের যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। কৃপাণে-কৃপাণে সঙ্গিনে-সঙ্গিনে মারামারি আরম্ভ হইল।

আর দুর্গরক্ষা করা চলে না। ইংরাজ-সৈন্যে দুর্গ পূর্ণ হইয়া উঠিল। একেবারে দুর্গের চারিদিক আক্রান্ত হইল। মাধবগিরির সর্ব্বাঙ্গ রুধিরপ্লাবিত। সহসা কি দেখিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিতে-করিতে লক্ষ্য-পদার্থের দিকে ছুটিলেন। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন, সে, সেই অপদার্থ জাফর খাঁ। দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত দেখিয়া, জাফর খাঁ পলায়ন করিতে-ছিলেন। মাধবগিরি ব্যাঘ্রের মত লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বজ্রকঠোরস্বরে কহিলেন,—"দুর্ব্বৃত্ত! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত!"

জাফর খাঁ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং অসি উদ্যত করিয়া সবলে প্রহার করিলেন। মাধবগিরির তরবারির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার কৃপাণ ভগ্ন হইয়া গেল। প্রতিহিংসাপরায়ণ মাধব তাঁহাকে অস্ত্র

অস্ত্র গ্রহণের অবকাশমাত্র না দিয়া, এক আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিলেন। হতভাগ্য জাফর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। মাধবগিরি পৈশাচিক অট্টহাসি হাসিয়া আর এক আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তরবারি চালনা করিতে-করিতে যেস্থানে মুসলমানে ইংরাজে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর কি ঘটিল, কেহ আর তাহার সঠিক সংবাদ দিতে পারে না।

কাসিম আলি আর শতচেষ্টা করিয়াও সৈন্যগণকে স্থির রাখিতে পারিতেছেন না। তাহারা যে, যেদিকে পাইতেছে পলায়ন করিতেছে। তিনি একা আর কি করিবেন। শরীরের চারি-পাঁচস্থানে অস্ত্রাহত হইয়াছেন। শোণিতক্ষয়ে দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, তথাপি রণে ভঙ্গ দিলেন না, যথাসাধ্য শত্রুনিপাত করিতে লাগিলেন। শরীরে আর সামর্থ্য নাই, দুর্ব্বল-হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। একজন ইংরাজ-সৈনিক সেইসময়ে তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। হার্ব্বার্ট দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া, বেগে অশ্বচালিত করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং অসি সঞ্চালন করিয়া সৈনিকের আঘাত প্রতিহত করিয়া কহিলেন, —"খবরদার! কেহ এই মহামনা আদর্শ বীরের অঙ্গস্পর্শ করিও না। শত্রু এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, এরূপ লোক সর্ব্বথা আমাদের সম্মানের পাত্র।"

কাসিমের মাথা ঘুরিতেছিল, অশ্বপৃষ্ঠে আর বসিতে পারিতেছিলেন না। কৃতজ্ঞতাপূর্ণনেত্রে সহাস্যে একবার বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছিলেন, হার্ব্বার্ট অশ্ব হইতে লম্ফ-

প্রদানপূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রসারিত বাহুর মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং অপরের সাহায্যে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে লইয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।

হাসান উল্লা দেখিলেন আর এ-দুর্ব্বার ইংরাজ-বাহিনীর গতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নয়। অকারণ লোকক্ষয় নিবারণার্থে শ্বেত-পতাকা উড়াইয়া দিয়া বিজয়ী শত্রুর করে আত্মসমর্পণ করিলেন। আমেদাবাদের দুর্গশীর্ষে ইংরাজের লোহিত-পতাকা প্রভাতারুণের লোহিত-রাগে রঞ্জিত হইয়া, প্রভাতসমীরে পৎপৎ শব্দে উড়িয়া ইংরাজের বিজয়ঘোষণা করিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত

বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে নগরে শান্তি স্থাপিত হইল। ইংরাজ সেনানীর অভয়বাণী শ্রবণে যাহারা নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, ক্রমে-ক্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। যাহারা রুদ্ধগৃহে কম্পিতকলেবরে অবস্থান করিতেছিল, সাহস পাইয়া পুনরায় রাজপথে বাহির হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে হার্ব্বার্ট রাজপ্রাসাদের মধ্যে দরবার করিয়া বসিলেন। একদিন এইস্থানে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নবাবের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন. আজ ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তিনি বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ পাইয়া বিচারকের আসনে উপবিষ্ট। আসে-পাশে বড়-বড় সেনানী—আর তাঁহার সম্মুখে হতভাগ্য নবাব বিচারপ্রার্থী হইয়া

অবনতবদনে দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িয়াছে।

হার্ব্বার্ট গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"নবাব সাহেব মুখ তুলিয়া চাও! দেখ দেখি আমায় চিনিতে পার কি না? সে-বড়-বেশী-দিনের কথা নয়, যেদিন আমি তোমার সম্মুখে নীত হইয়াছিলাম, তুমি আমার প্রতি যে-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলে, আজ যদি আমি তোমাকে সেই দণ্ডে দণ্ডিত করি, আশা করি, তুমি আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবে না।"

নবাবের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে-ভীষণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি শত্রুর প্রতি যে-বর্ব্বরনীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, আজ যদি তাহারা তাঁহার প্রতি সেই নীতি অবলম্বন করে, তাঁহার অভিযোগ করিবার কি আছে? ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, পরাজিত জাতির প্রতি কখনও যে-করুণা প্রকাশ করেন নাই, তাহারাই বা তাঁহাকে সহৃদয়তার সহিত ব্যবহার করিবে কেন?

নবাব অধোবদনে রহিলেন। তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া হার্ব্বার্ট পুনরায় কহিলেন,—"আমরা তোমার মত বর্ব্বর-প্রকৃতি নই। তুমি আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও, আমরা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রদর্শিত-নীতির অনুসরণ করিব না। তোমার প্রতি যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডের ব্যবস্থা করিলাম। নন্দীপুরের পর্ব্বতদুর্গে তুমি আবদ্ধ থাকিবে। তোমার স্বাধীনতা-অপহরণ-ব্যতীত, তোমার প্রতি অন্য কঠোরতা অবলম্বিত হইবে না। ইচ্ছা করিলে তুমি স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ঐ-দুর্গে বাস করিতে পারিবে কিন্তু দুর্গ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। যদি কোন দুর্ব্যবহার না কর, আমাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে

না। নন্দীপুর দুর্গে তোমাকে রাখিবার কারণ,—ঐস্থান তোমার পৈশাচিক-নিষ্ঠুরতার লীলাক্ষেত্র—উহার নিদারুণ-স্মৃতিই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে সহায় হইবে।"

নবাব কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে অভিবাদন করিয়া প্রহরীবেষ্টিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার পর সুজা আলিকে আমেদাবাদে স্থাপন করিয়া, হার্বার্ট দরবার ভঙ্গ করিলেন।

নগরের রাজপথ, গৃহপ্রাচীর এবং নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে বহুদিন এই ভীষণ-যুদ্ধের রক্তাক্ত-স্মৃতি বর্ত্তমান ছিল। এস পাঠক ফুলশর-গর্ব্বহারিণী ফুলকুমারীর একবার সন্ধান লই। সেই রাত্রে জাফর খাঁর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া—সেই ভগ্ন-মন্দির হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

তিনি জাফর সাহেবের এক আত্মীয়ের বাটীতে গোপনে বাস করিতেছিলেন। কাসিম আলির সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে যে-ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন। পিশাচ-পিশাচী যখন শুনিল তাহাদের পৈশাচিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, তখন আর তাহাদের আক্ষেপের সীমা রহিল না। রণদুন্দুভির গভীর-নির্ঘোষে তাহারা আর অভিনব কোন চক্রান্তের উদ্ভব করিবার অবসর পাইল না। এত গোল-যোগের মধ্যেও জাফর নব-প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইত। তাহার পর যখন খাঁ সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সেই বিপদের সময়ও ফুলকুমারীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। ফুলকুমারী এখন স্বাধীনা, স্বেচ্ছাচারিণী। আর তাহার গোপনে বাস করিবার আবশ্যক রহিল না।

কিন্তু এ-সুখ অধিকদিন স্থায়ী হইল না। মনে করিয়াছিল,

যুদ্ধাবসানে সুরসিক জাফর খাঁকে লইয়া, তাহার প্রণয়ে বিভোর হইয়া দিনকতক সুখে অতিবাহিত করিবে কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। যুদ্ধ শেষ হইল, কিন্তু তাহার প্রণয়-কুঞ্জের পিকবধূ, যৌবনরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। ফুলকুমারী শঙ্কিতা হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ তাহার দৃঢ়-প্রতীতি জন্মিল জাফর খাঁ জীবিত নাই। তাহার নেত্রকুবলয়ে জল আসিল। সে অশ্রুপ্রবাহে তাহার বিরহ-বেদনাটা অনেকটা ভাসিয়া গেল। তখন অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে ভাবিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে? পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে কি না? না, সেখানেও আর ফিরিতে সাধ নাই। মা অবশ্য ভালবাসিবে, ভাই অবশ্য স্নেহ করিবে কিন্তু তাহাতে তাহার আশা মিটিবে কি? তাহা যদি না মিটে, পুনরায় সে-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার আবশ্যক কি?

বিরহ-বিধুরা ভাবিতে লাগিল, তবে এবার সে কি করিবে? তাহার পোড়ার মুখে একটু হাসি আসিল। সবাই ত আর কাসিম আলি নয়—সংসারে অনেক জাফর সাহেব আছে। তাহার যৌবনের পণ্যবিথীকায় যতদিন রূপের ঠাট বজায় থাকিবে, ততদিন তাহার ভাবনা কি? পোড়ারমুখী ফুলকুমারী চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া বসিল এবং নাগরের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

তাহার উদ্দেশ্য একরূপ বিনা-আয়াসেই সিদ্ধ হইল। জাফর সাহেবের যে-আত্মীয়ের বাড়ীতে সে বাস করিতেছিল, তাহার নাম মুরাদ আলি। সুশ্রী পুরুষ, বয়সও বেশী নয়। ফুলকুমারী প্রথমদিন তাহাকে দেখিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে একটু হাসিল,—পর-স্ত্রীর হাসিতে বুঝি কি মাদকতা আছে? মুরাদের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ফুলকুমারীর দিকে সোৎসুক নয়নে চাহিয়া

রহিল—এবার ফুলকুমারী শুধু হাসিল না, মন্মথের শরাসনতুল্য যুগ্ম-ভ্রু-ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া দুই-একটী কটাক্ষ-শায়কও নিক্ষেপ করিল।, আর কি রক্ষা আছে! মুরাদ-পাখী বাণবিদ্ধের ন্যায় ফুলকুমারীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।

মুরাদের পত্নী হামিদা বড়ই কোপন-স্বভাবা আর বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইলে কোন শান্তশীলাই বা সহ্য করিতে পারে? তাহাদের আলয়ে আশ্রিত-ফুলকুমারীকে, তাহার স্বামীর সহিত প্রেমালাপ করিতে দেখিয়া, হামিদার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে, রাগ সামলাইতে পারিল না। সম্মুখেই একখানা আঁইস-বঁটি পড়িয়াছিল, সেইখানা হাতে করিয়া ছুটিল। মুরাদ ভামিনীকে সশস্ত্র রণে আগুয়ান নিরীক্ষণ করিয়া, ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। ফুলকুমারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং হামিদার উদ্দেশ্য বুঝিয়া কোন রূপ বাধা প্রদান করিবার পূর্ব্বেই হামিদা বামহস্তে তাহার নাকটী ধরিয়া, একটা প্যাঁচ বসাইয়া দিল। ছিন্ননাসা হইয়া, ফুলকুমারী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সেই নাকিস্বরের আর্ত্তনাদ শুনিয়া মুরাদের ভগ্নী রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, ফুলকুমারীর পরিধেয় বস্ত্রখানা শোণিতে লাল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে ছিন্ননাসা পতিত, পার্শ্বে ভ্রাতৃজায়া বঁটিহস্তে দণ্ডায়মানা। সুতরাং কি হইয়াছে বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না।

মুরাদ-ভগ্নী সভয়ে কহিল,—"ও-বউ! ও-হতভাগী! এ-কি করলি?"

হামিদা কহিল,—"ঠিক করিয়াছি, শয়তানী আমার বাড়ীতে বাস করিয়া, আমারই বাড়া-ভাতে ছাই দিতে উদ্যত। তোমার ভাইটী সরিয়া পড়িল, নচেৎ তাহারও একটী কাণ কাটিয়া দিতাম।"

এতক্ষণে ভগ্নী সকল রহস্য বুঝিতে পারিল। ফুলকুমারীর প্রতি

তাহার আর সহানুভূতি রহিল না। গালি দিয়া কহিল,—"যেমন কাজ করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত ফল হইয়াছে! কুলটার ঐ-রকম শাস্তি হওয়াই আবশ্যক। কাটা নাক ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়, নহিলে বৌ যে-রকম রাগিয়াছে, শেষে কি প্রাণটা হারাইবে?"

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ফুলকুমারীর মনে বড়ই ঘৃণা জন্মিল। এ-বিভৎস দৃশ্য লইয়া লোকের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? আর কোন্ মুখেই বা পিত্রালয়ে যাইবে? ফুলকুমারী গাত্রোত্থান করিল এবং বেগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, নিকটস্থ নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িয়া, বিলাসবিভ্রান্ত পাপ-জীবনের অবসান করিল!

মুরাদ তিনদিন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই, অবশেষে তাহার ভগ্নীর মারফৎ পত্নীর অভয় পাইয়া বাড়ীর মধ্যে আগমন করে। বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল, মুরাদ ভায়া সেই রাত্রে হামিদার সম্মুখে নাকে-কানে খৎ দিয়া, আর ওরূপ গর্হিত কার্য্য করিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত, তাহা বর্ণে-বর্ণে পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার—তারামঠে

উভয়পক্ষের রণ-কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি হইলে, যোগানন্দ পিতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহই তাঁহার কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তখন তিনি শবাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রত্যেক মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগি-

লেন। মাধবগিরির দুই-চারিজন অনুচরও তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিল। একজন কহিল,—"আমরাই প্রথমে দুর্গ প্রবেশ করি। আমি বরাবরই ঠাকুরের সঙ্গে ছিলাম। পাপিষ্ঠ জাফর খাঁকে তাহার কৃত-অত্যাচারের দণ্ডবিধান করিয়া, তিনি যে কোন্ দিকে গেলেন, আমি আর লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইলাম না।"

যোগানন্দ কহিলেন,—"আমিও বহুবার জাফর খাঁকে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু একবারও তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই। তাহার সহিত কোন্ স্থানে পিতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

"আসুন দেখাইয়া দিতেছি—" বলিয়া সে-ব্যক্তি অগ্রসর হইল। যোগানন্দ প্রভৃতি তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুর্গতোরণের নিকট আসিয়া কহিল,—"ঐ দেখুন, তাহার মাথা গড়াগড়ি যাইতেছে।"

যোগানন্দ তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,— "উহারই জন্য আমাদের এই অবস্থা—ব্রাহ্মণ-সন্তান আজ অসিচর্ম্ম-ধারী।" তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় পিতার মৃতদেহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে অনেক পরিশ্রমের পর, অসংখ্য শবরাশির মধ্যে তাঁহার ঈপ্সিত-দ্রব্যের সন্ধান পাইলেন। চারিপার্শে অগণিত শত্রুর মৃতদেহ পতিত। যোগানন্দ বুঝিলেন বহু-অরাতিকে শমনসদনের অতিথি করিয়া, তিনি বীরের মত রুধিরাক্ত রণাঙ্গণে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। শরীরের বহুস্থানে অস্ত্রের আঘাত-চিহ্ন। যোগানন্দ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। এইসময়ে হার্ব্বাট তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার বীরহৃদয়ও বিচলিত হইল। তিনি যোগানন্দের পার্শ্বে বসিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিতে

পরামর্শ দিলেন। যোগানন্দ তাঁহার অনুচরবর্গের সাহায্যে পিতৃদেহ নদীতীরে সমানীত করিয়া যথারীতি তাঁহার সৎকার করিলেন।

যোগানন্দের মনে বৈরাগ্য-সঞ্চার হইল! তিনি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। হার্বার্ট তাঁহাকে বিরত করিতে অনেক প্রয়াস পাইলেন, তাঁহাকে উচ্চপদ, প্রভূত ধনসম্পত্তি দিবার প্রলোভন দেখাইলেন কিন্তু যোগানন্দ আর কিছুতেই সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বিনীতস্বরে কহিলেন, —"সাহেব! আমার পূর্ব্ব-ইতিহাস সবই অবগত আছেন, যে-জন্য আমার অসিধারণ, তাহা সফল হইয়াছে। আমার প্রবৃত্তি বা বিবেক-বুদ্ধি আমাকে আর এ-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে উৎসাহিত করিতেছে না। এতদিন উত্তেজনার মদিরাপানে যাহা করিয়াছি, এখন আর সে-উত্তেজনা নাই—জীবনে একটা অবসাদ আসিয়াছে —এখন শান্তিপথের পথিক হইয়া, ভগবানকে ডাকিবার জন্য প্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে; অতএব আমাকে আর বাধা দিবেন না।"

হার্বার্টের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। কহিলেন,—"না ভাই! আর তোমাকে বাধা দিব না। তোমাকে আমি সহোদরের মত ভালবাসি এবং ভক্তি করি। তুমি যে আমার জীবন-রক্ষক এ-কথা জীবনান্তপর্য্যন্ত বিস্মৃত হইব না। যেখানেই যাও, আমাকে মনে রাখিও। ভগবান তোমার সাধু-উদ্দেশ্য সফল করুন।"

তিনি যোগানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েরই চক্ষে জল— উভয়েরই হৃদয়ে গুরুভার। তাহার পর তাঁহার পিতার দলস্থ সমবেত যোদ্ধৃগণের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"তোমরা এখন কি করিবে? তোমাদের দলপতি আর নাই। সাহেব তোমাদের শৌর্য্য-বীর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি তোমাদের সকলকেই পুরস্কৃত করিবেন।

যদি তোমরা যুদ্ধ-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে এখনও অভিলাষী হও—সাহেব সানন্দে তোমাদিগকে তাঁহার সিপাহী-দলে ভুক্ত করিয়া লইবেন; আর যদি এ-ব্যবসায়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, গৃহে গিয়া স্ব-স্ব জাতীয় ব্যবসা আশ্রয় করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পার। ন্যায়বান ইংরাজ-রাজত্বে আর অত্যাচারের ভয় নাই। তবে একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।' তোমাদের দলপতি তোমাদিগকে যে-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, সে-ধর্ম্ম-পথ হইতে আর যেন কদাচ বিপথে যাইও না। তিনি তোমাদিগকে দস্যুরূপে পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে দেবতায় পরিণত করিয়া গিয়াছেন। রণক্ষেত্রে বা গৃহে যেখানেই থাক, ধর্ম্ম-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না।"

তাহাদের চক্ষে জল আসিল। সকলে একবাক্যে তাঁহার উপদেশ মত চলিতে প্রতিশ্রুত হইল। অধিকাংশই ইংরাজের সিপাহী হইল, কতিপয় ব্যক্তিমাত্র তাহাদের পল্লীনিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শান্তির সুশীতল ছায়ায় কালাতিপাত করিতে লাগিল। যোগানন্দ জয়ন্তীর, সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহারও একটা সুব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া প্রদেশান্তরে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

কাসিম আলি পরিচর্য্যার গুণে মাসার্দ্ধের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। হার্ব্বাট স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, অদ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কাসিম আলি উঠিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন আছেন আপনি? বেশ সুস্থ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

কাসিম। আপনার অসীম-দয়ায় এবার আমার জীবনরক্ষা হইয়াছে। ইংরাজজাতি শত্রুর প্রতি যে এত সদ্ব্যবহার করে তাহা আমি জানিতাম না।

সাহেব। আলি সাহেব বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন যে, মুসলমান জাতির মধ্যেও মহত্ত্ব এবং দেবত্ব নিতান্ত দুর্লভ নয়। আমি যদি আপনার প্রতি কোন সদ্ব্যবহার করিয়া থাকি, তবে সেটা জানিবেন আপনার নিকট আমি যে মহাঋণে আবদ্ধ, তাহার আংশিক পরিশোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। যিনি উদ্যত শত তরবারির আঘাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য মাথা পাতিয়া দিতে পারেন, পরে তিনি রণক্ষেত্রে শত্রুরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেও, আমার ভক্তির পাত্র।

কাসিম। এক্ষণে আমার উপর কিরূপ দণ্ডের আদেশ হইবে? আমার ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

সাহেব। আপনি স্বাধীন! এ-স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে কেহই আপনাকে বাধা দিবে না।

কাসিম। সত্যই কি আমি মুক্ত:

সাহেব। হাঁ আপনি মুক্ত,—তবে আমার একটা প্রার্থনা আছে। যদি আপনার অনভিমত না হয়, ইংরাজ কোম্পানির অধীনে সৈনিক বিভাগে একটা কর্মগ্রহণ করুন।

কাসিম। এ-ও সত্য?

সাহেব। সত্য। আপনি উদারচরিত্র বীরপুরুষ, আমরা আপনার বীরত্বের মর্যাদা রক্ষা করিব।

কাসিম। এ-কথার উত্তর কাল আমি আপনাকে দিব।

সাহেব। উত্তম। আপনি এখন যথেচ্ছ যাইতে বা ইচ্ছা করিলে আমার শিবিরে অতিথিরূপে বাস করিতে পারেন।

কাসিম। নগরমধ্যে আমার একটু প্রয়োজন আছে কাল আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

উভয়ে করমর্দ্দন করিয়া আপন-আপন গন্তব্য-স্থানের অভিমুখে চলিলেন। কাসিম কোথায় চলিতেছেন, পাঠককে কি বলিয়া দিতে হইবে? খাঁ সাহেবের বিধবা-পত্নী আমিনা এখন কোথায়, তাহারই সন্ধান লইতে চলিয়াছেন। নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, খাঁ সাহেবের বিধবা-পত্নীদ্বয় নগরোপকণ্ঠে বাস করিতেছে, আর একজন জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। রুদ্ধশ্বাসে কাসিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ পত্নী ডুবিয়া মরিয়াছে?" উত্তর হইল,—"ফুলকুমারী।"

তিনি কিছু অন্যমনা হইয়া, নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইলেন এবং অনুসন্ধানে বাড়ী ঠিক করিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। দ্বার খুলিয়া দিয়া কাসিমকে দেখিবামাত্র ফতেমার মুখভাব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, হাস্যমুখে তাঁহাকে একখানা ঘরে বসাইয়া আমিনাকে সংবাদ দিতে গেল। কাসিম রুদ্ধনিশ্বাসে আমিনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সে-সময় চাঁদমণি বাড়ীতে ছিলেন না, প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। প্রভাতপবনে নবলতিকার মত কাঁপিতে-কাঁপিতে লজ্জারক্তিমবদনা,, অর্দ্ধকৃতাবগুণ্ঠনা আমিনা আসিয়া কক্ষ-বাহিরে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। কাসিমও কম্পিতহৃদয়ে অথচ শশব্যস্তে তাঁহার নিকটে গিয়া, মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"কেমন আছ আমিনা? আমি তোমার সন্ধান লইতে আসিয়াছি।"

আমিনার মুখ দিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, একবার মাত্র মুখ তুলিয়া চাহিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে চেষ্টামাত্র। তাঁহাকে অধিকতর সঙ্কুচিত দেখিয়া কাসিম আরও একটু সরিয়া গিয়া কহিলেন,—"তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? পূর্ব্বে আসি নাই বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছ? আমি আহত হইয়া ইংরাজের কারাগারে ছিলাম, মুক্ত হইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি।"

আমিনা কি বলিতে যাইতেছিলেন—তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিল, কিন্তু পোড়া লজ্জা আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। কাসিম আর থাকিতে পারিলেন না, ধীরে-ধীরে তাঁহার হাত ধরিয়া কক্ষের মধ্যে লইয়া আসিলেন, তাহার পর বামহস্তে তাঁহার সুঠাম ক্ষুদ্র-দেহ লতিকা বেড়িয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা মুখখানি তুলিয়া আবেগভরে কহিলেন,—"আমিনা! আমিনা! সেই হইতে আমি যে তোমায় ভুলিতে পারি নাই! শরদাকাশে শশধরের মত তোমার এই মুখখানি সর্ব্বদা যে আমার হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে! বল বল আমিনা! তুমি কি এই অভাগাকে ভালবাসিবে? কাসিমের দগ্ধহৃদয় কি তোমার প্রেমের সুধাধারায় শীতল হইবে?"

আমিনার নেত্রকুবলয় এতক্ষণ মুদ্রিত ছিল, প্রভাত-রবিকর-স্পর্শে কমলিনী যেমন ধীরে-ধীরে নয়ন মেলিয়া চায়, আমিনাও তেমনই করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সে-স্নিগ্ধ-কোমলদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বদনের উপর স্থাপিত হইয়া আবার অবনত হইয়া পড়িল। সেই ক্ষণিক দৃষ্টির যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে মুখরার মত বলিত, —"তাহাও কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? আমিনা-চাতকিনী যে তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে।"

কাসিম সে-দৃষ্টির অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিয়া, ধীরে-ধীরে, যেন কত ভয়ে-ভয়ে আমিনার ফুল্ল-রক্তাধরে স্বীয় অধর স্থাপন করিলেন। মুদ্রিত-কমল আবার বিকসিত হইল। যুবতী আবার নয়ন মেলিয়া চাহিলেন। তাহার পর ধীরে-ধীরে অশিক্ষিতের হাতে বীণার রবের মত বেতালা, বেসুর কিন্তু মধুর, শ্রুতিসুখকর একটী আধটী করিয়া বোল ফুটিতে লাগিল। তখন দুইজনে একাসনে বসিয়া সুখ-দুঃখের কথা, বিরহব্যথার পরিচয় দিতে

লাগিলেন। বলা বাহুল্য বিদায়কালে কাসিম ফতেমাকে ডাকিয়া তাহার সহিত কি পরামর্শ করিয়া গেলেন।

পরদিন হার্ব্বার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাসিম কহিলেন,—"আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত, তবে উপস্থিত সৈন্যদলে যোগ দিতে পারিব না। একমাস পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

হার্ব্বাট তাহাতেই সম্মত হইলেন। কাসিম আবার আমিনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চাঁদমণি ফতেমার মুখে সকল কথা শুনি-লেন কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না! একযাত্রার পৃথক ফল দেখিয়া মনে-মনে কিছু ক্ষুন্ন হইলেন।

যথাসময়ে কাসিম আলির সহিত আমিনার বিবাহ হইল। কাসিম পত্নীর সহিত জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাসিমের মা সকল কথা শুনিয়া এবং সুন্দরী আমিনাকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া সুখী হইলেন। কাসিম একমাস কাল আমিনার সহবাসে অতিবাহিত করিয়া, যথাসময়ে সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। আমিনা এবং তাঁহার ধাত্রী ফতেমা বাড়ীতেই রহিলেন। কাসিম বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দিনে-দিনে উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। যখন দেশে কোন যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিত, বাড়ীতে আসিয়া আমিনার প্রেমের ছায়ায় রণশ্রান্তি বিদূরিত করিতেন।

একপক্ষ পরে জয়ন্তী সেই গিরিকন্দরে আসিয়া দেখিলেন, মহা-পুরুষ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা নীলা-চলাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে বহু তীর্থ দর্শন করিয়া দুই মাস পরে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা যতই পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন, তাহার গম্ভীর মহান্ ভাব দেখিয়া, জয়ন্তীর হৃদয় বিস্ময়ানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে

লাগিল। অবশেষে শৈল-শিখরে অবস্থিত তারামঠের বিবিধ-কারু-কার্য্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য তাঁহাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইল। অপরাহ্ণে তাঁহারা মঠে উপনীত হইলেন। মঠের পুরোহিত দেবানন্দ শর্ম্মা মঠের সম্মুখস্থ চত্বরে বসিয়া ভাগবৎ পাঠ করিতেছিলেন। মহা-পুরুষকে সমাগত দেখিয়া, তিনি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন, তাহার পর অনুসন্ধিৎসু হইয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিলেন। সাধুপুরুষ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন,—"ইনি সংসার-বিরাগিণী যোগিনী—মার সেবায় জীবনপাত করিতে আসিয়াছেন। এখন হইতে ইঁহার ভার আপনার উপর ন্যস্ত হইল।"

জয়ন্তী দেবানন্দের চরণধূলি মাথায় লইয়া মধুরকণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা! আমি আপনার কন্যা। ভগবতীর আরাধনায় জীবনসার্থক করিব বলিয়া আপনার আশ্রমে আসিয়াছি।"

দেবানন্দ কহিলেন,—"তুমি আমার মা! নিরাকারা তারার চৈতন্যময়ী, সাকারা মূর্ত্তি! পিতাপুত্রীতে মিলিয়া ঐ পাষাণীবেটির সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব।"

তৎপরে দেবানন্দ তাঁহাদের আহার্য্যাদির সংগ্রহে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া সাধু কহিলেন,—"সন্ধ্যা সমাগতা, মার সান্ধ্য আরতি দেখিয়া, জলযোগাদি করিব, ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই।"

শৈলশিখরে প্রকাণ্ড মন্দির বা মঠ—তাহার মধ্যে আদ্যাশক্তি ভগবতীর পাষাণময়ী তারামূর্ত্তি অবস্থিত। কোন্ অনাদি কাল হইতে তিনি ঐ-স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এবং কোন্ নৃপতির রাজত্ব-কালেই বা ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কেহ তাহার সঠিক সংবাদ দিতে পারে না। দেবানন্দ শর্ম্মার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ হইতে কয়েক পুরুষ পুরুষানুক্রমে মার সেবা করিয়া আসিতেছেন। মন্দির বাহিরে

পর্ণকুটীরে তাঁহারা বাস করেন। দেবানন্দ শর্মার সংসারে গৃহিণী, পুত্র প্রেমানন্দ এবং নরোত্তম নামে একটী বৃদ্ধ পরিচারক। বাড়ীতে দুই-তিনটী গাভী আছে। পর্ব্বতজাত ফলমূল এবং দেশান্তর হইতে আগত-যাত্রীর প্রদত্ত-অর্থই ঐ কয়েকটী প্রাণীর জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। এই নির্জ্জন-শান্তিময় শৈলশিখরে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থান করিয়া দেবীর আরাধনায় পরমানন্দে তাঁহাদের জীবনাতিবাহিত হইত। বৎসরের মধ্যে একবার—বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। ভক্তিপ্রাণ বহুনরনারী বহুদূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া, দেবীর চরণতলে ভক্তিচন্দনলিপ্ত সাধনার কুসুমরাজি অর্পণ করিয়া যায়। বৎসরের মধ্যে সেই একবার এই শান্ত, নীরব গিরিশিখর ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত ভক্তের মা-মা রবে মুখরিত হইয়া উঠে। তাহার পর আবার যে নীরব সেই নীরব।

নরোত্তম মৃৎপাত্রে জল আনিয়া দিল। সাধু এবং জয়ন্তী হস্ত মুখাদি ধৌত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দেবানন্দ দেবীর আরাধনায় উদ্যোগী হইলেন। এতক্ষণ মার দ্বাররুদ্ধ ছিল। নরোত্তম দ্বার খুলিয়া দিল। শঙ্খ-ঘণ্টা এবং কাঁসরের শব্দে শৈল-প্রদেশের শান্ত, শীতল সান্ধ্য-দৃশ্যের মধ্যে স্বতঃই ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা উথলিয়া উঠিতে লাগিল। সাধু জয়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। জয়ন্তীর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি বহুস্থলে তারামূর্ত্তি দেখিয়াছেন কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্তিরসাত্মকমূর্ত্তি আর কখনও তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তিনী হয় নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আরতি হইল, জয়ন্তী গললগ্নীকৃতবাসে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার উভয় গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

সান্ধ্যআরতি শেষ হইলে, সাধু দেবীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে "তারা-তারা" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে ডাকে পাষাণ-প্রতিমা সাড়া দিলেন কি না জয়ন্তী শুনিতে পাইলেন না কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মায়ের ভক্ত-সন্তান মায়ের সাড়া পাইয়াছেন, নচেৎ তাঁহার মুখমণ্ডল অমন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কেন? "তারা-তারা" বলিতে নয়ন-তারা কাটিয়া অমনধারা আনন্দ-ধারা বহিবে কেন? ডাকার মত ডাকিতে না পারিলে মায়ের সাড়া পাওয়া যাইবে কেন? তাঁহার মনে হইতে লাগিল মাও মৃদু-মৃদু হাসিতেছেন—ভীমা করালিনী বরপ্রদা হইয়া যেন দুলিতেছেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন করুণার শতধারা বিস্ফুরিত হইয়া পড়িতেছে। ভক্ত মা-মা রবে মার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তি-গদ-গদকণ্ঠে মার স্তব করিতে লাগিলেন,—

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
খড়্গকর্ত্তৃ সমাযুক্ত-সব্যেতর ভুজদ্বয়াং।
কপালোৎপল সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাং॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্য ভূষিতাং।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয় ভূষিতাং॥
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং;
সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার বিভূষিতাং॥

বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং ।
অক্ষোভ্যো দেবীমূর্দ্ধন্য-স্ত্রিমূর্ত্তির্ণাগরূপধৃক্ ।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমঽস্তুতে

সাধক দেবীচরণে প্রণাম করিয়া বসিলেন। জয়ন্তীও তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া প্রণত হইলেন।

দেখিতে-দেখিতে নীলাচলে তারামঠে জয়ন্তীর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। তিনি এখন প্রকৃতই যোগিনী—অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেবীর আরাধনায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। সাধুসংসর্গে এবং সৎগুরুর প্রসাদে দিন-দিন সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। স্থানমাহাত্ম্যে এবং যোগসাধনায় মনশ্চাঞ্চল্য তিরোহিত হইয়াছে। ভেদাত্মিকা বুদ্ধির লোপ পাইয়াছে—সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান জন্মিয়াছে।

বৈশাখ মাসে দিগ্‌দেশাগত যাত্রী আসিয়া যোগিনীর শান্ত-সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া ভগবতীর সঙ্গিনী যোগিনী জ্ঞানে উচ্ছ্বলিত ভক্তি-প্রবাহে অবনত-মস্তকে তাঁহার বন্দনা করিত। বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া তাঁহার কঠোর যোগ-সাধনা নিরীক্ষণ করিয়া মনে-মনে ভাবিত, কে এই যৌবনে-যোগিনী?